কবিতার মুহূর্ত

কবিতার মুহূর্ত

শঙ্খ ঘোষ

অ

অনুষ্টুপ প্রকাশনী

২ই, নবীন কুণ্ডু লেন কলকাতা-৭০০০০৯

KABITAR MUHURTA

By Sankha Ghosh

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬০, এপ্রিল ১৯৫৩

প্রকাশক :
অনিল আচার্য
অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
জি. আর. টি. প্রিন্টার্স
২০ পঞ্চাননতলা রোড
লেকটাউন, কলকাতা

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রচ্ছদমুদ্রণ :
কোলো প্রিন্ট
৮০/২ বৈঠকখানা রোড
কলকাতা-৭০

বাঁধাই :
গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স
৭৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচি

১

পা তোলা পা ফেলা ১৩

কবিতার মুহূর্ত ১৭

২

আত্মতৃপ্তির বাইরে ১০৫

প্রবাহিত মনুষ্যত্ব ১১৩

বিশেষণে সবিশেষ ১২৩

উৎসর্গ

আমারই বুক থেকে ঝলক
পলাশ ফুটছিল সেদিন

লোকেরও লাগছিল ভালো
লোকের ভালো লাগছিল

লোকে কি জেনেছিল সেদিন
এখনও বাকি আছে আর কে ?

আসলে ভেবেছিল সবই
উদাস প্রকৃতির ছবি ।

তবু তো দেখো আজও ঝরি
কিছু-না থেকে কিছু ছেলে

তোমারই সেণ্ট্রাল জেলে,
তোমারই কার্জন পার্কে ।

সূচনা

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আত্মকথা বলবার প্রবণতাও বেড়ে যায় বলে শুনেছি। এ-বইয়ের প্রথমাংশ হয়তো তারই এক অলজ্জ নিদর্শন।

কিছুদিন আগে এক তরুণ এসে বলেছিলেন, 'যমুনাবতী' কবিতাটি পড়বার পর একটা সঞ্চার তাঁর মনে ঘটে, কিন্তু ওরই সঙ্গে অস্ফুটভাবে এও যেন তাঁর মনে হয় যে কোনো সত্য ইতিহাসের বিন্দুকে হয়তো-বা ছুঁয়ে আছে ওই লেখা। সে-ইতিহাস কি জানা যায় কোনোভাবে?

কিন্তু, সে-ইতিহাস জানা কি জরুরি খুব? প্রত্যক্ষ কোনো ঘটনার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে থাকে যে লেখা, তাকে নিয়ে এই এক সংকট। ঘটনা থেকে তার মূল সত্যটা যদি কবিতায় পৌঁছে থাকে, তবে নিছক সেই ঘটনাটুকু জানবার আর কী দরকার? আর, মূল এবং সাধারণ সেই সত্যে যদি না-ই পৌঁছে থাকে লেখা, তবে ইতিহাসটা জেনেই-বা কী লাভ?

অবশ্য, এই শেষ প্রশ্নটা তৈরি হয় কবিতার অভিমান থেকে। সে-অভিমান ছেড়ে একটু সরে এলে মনে হয়, যদি এমনও হয় যে কবিতাটা ব্যর্থ, কিন্তু কবিতাটির সূত্র ধরে পুরোনো সময়কেই আরেকটু স্পষ্ট করে ছুঁতে চান কোনো পাঠক, সে-ই বা কী কম! উনিশকুড়ি বছরের সেই তরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যায় আমার ওই বয়সেরই কথা, 'যমুনাবতী' যখন লেখা হয়েছিল। বয়স্ক কারো কারো স্মৃতির কথা ছেড়ে দিলে, সেদিনকার ছবি কতটুকু আর বেঁচে আছে আজ এই দিনের মানুষের কাছে? আরওয়ালের কথা হয়তো জানবেন আজকের দিনের তরুণ, কিন্তু কেমন করে জানবেন তিনি পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো কুচবিহারের কোনো ছোটো অথচ তাৎপর্যময় ঘটনা?

কবিতার মধ্য দিয়ে তাই পিছনের দিনগুলিতে একবার ফিরে যেতে থাকি। যেতে যেতে দেখি একটা পথরেখা চিহ্নিত হয়ে আছে, কিছু-বা ব্যক্তি-

গত কিছু-বা ঐতিহাসিক স্মৃতিতে মিলেমিশে যাওয়া এক সময়পথ। কেবল, সম্ভাব্য পাঠককে মনে রাখতে বলি, সে-পথের অনুষঙ্গে যে কথাগুলি এসেছে এখানে, সেটাই কবিতাগুলির পরিচয় নয়, সে হলো এর সূচনাবিন্দু মাত্র।

এ-বইয়ের হ্রস্বতর দ্বিতীয় অংশে যে-লেখাগুলি রইল, ঈষৎ ভিন্ন অর্থে সেও ছুঁয়ে আছে আমার সেই পথ, সেই সময়, আমার কাছে সেও আমার কবিতারই মুহূর্তযাপন।

আরো অনেক খুনের মতো, কার্জন পার্কে একদিন প্রবীর দত্তকে খুন করেছিল পুলিশ। তার অল্পদিন পর বসন্তের পলাশ দেখে পথচারীদের এক স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তৈরি হয়েছিল একটি লেখা। প্রকাশিত সেই পুরোনো লেখাটি রইল এ-বইয়ের উৎসর্গ হিসেবে।

কয়েকটা দিনের মধ্যে বইটির রচনা এবং মুদ্রণ হতে পারল মস্ত-এক সমবায়ের ঘোরে। সমস্ত জীবনই পরিবেশের কাছে যে ব্যক্তিগত প্রশ্রয় পেতে পেতে চলেছি, 'অনুষ্টুপ'-সংলগ্ন কর্মীদের অবিরাম উৎসাহ আর পরিশ্রম তারই এক নতুন উদাহরণ হয়ে রইল আমার কাছে। তবে, প্রকাশিত হয়ে যাবার পর তাদের মুখে আশাভঙ্গের যে করুণ ছায়া দেখব, সেইটে ভেবে শুধু কষ্ট হয়।

পা তোলা পা ফেলা

কবিতার একটা নিজস্ব আবরণ আছে। তার ভিতরে প্রচ্ছন্ন রেখে অনেক কথা বলে নেওয়া যায়, অনেক আত্মপ্রসঙ্গ, কত বলেওছি হয়তো। কিন্তু গদ্যে নিজের বিষয়ে লিখতে ভয় হয়, গদ্য এত সরাসরি কথা বলে, এত জানিয়ে দেয়। কেবলই মনে হয় প্রকাশ্য করে এসব বলবার সময় নয় এখন। হাত থেকে কেবলই খসে যায় কলম, যে-কথাটুকু বলবার ছিল সেটুকুও ধরতে পারি না ঠিকমতো। এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত জানি না আর কটা দিন লিখতে পারব কবিতা।

সকলেই একদিন ছেলেখেলায় শুরু করে কৈশোরে। তারই মধ্য থেকে কখন জেগে ওঠে শরীর, তার নিজেরও অগোচরে। না-শহর না-গ্রাম আমাদের সেই পদ্মাপারের ছোট্ট জনভূমি, একদিকে নদী একদিকে বন, তার মাঝখানে বারো বছর বয়সে আমারও একদিন শুরু হয়েছিল ছন্দমেলানোর খেলা, একেবারে দায়হীন, প্রগল্‌ভ। বিষয়ের কোনো ভাবনা ছিল না তখন, যে-কোনো উপলক্ষই ছিল রচনার উপলক্ষ। এ-রচনার যে সঙ্গী ছিল না কেউ, এক হিসেবে সেই ছিল ভালো। খাতার পর খাতা ভরে উঠছিল কেবল তুচ্ছ আনন্দে। আর তারপর, প্রায় একসঙ্গেই পৌঁছল আমাদের যৌবন আর স্বাধীনতা। আর সেই আমার কলকাতায় সত্যিকারের পা দেওয়া।

ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে একদিন কলকাতা দেখিয়েছিলেন বাবা, মনে পড়ে। এই হলো রামমোহনের বাড়ি, এইখানে ছিলেন বিদ্যাসাগর, এই জোড়াসাঁকো; আর খোলা পথের ধারে এসব কাটাফল যেন খেয়ো না কখনো। ছোটোবেলায় অন্ধকার উঠোনের ইজিচেয়ারে শুয়ে যে রাত্রিবেলার আকাশ দেখাতেন বাবা, তার চেয়ে কত ভিন্ন এটা। একদিন এই পৃথিবী না কি ছিল না, তারও আগে একদিন ছিল না এই গ্রহতারাময় বিশ্বলোক, এই কথা শুনে তখন বুক ঠাণ্ডা হয়ে যেত হঠাৎ। না-থাকাটা ছিল

কোথায়? কোন্ ধারণাহীন পাত্রে? এই অস্পষ্ট ভাবনার ভয়ে ছোটোবেলায় যে কুঁকড়ে যেতাম লেপের মধ্যে, তার চেয়ে কত ভিন্ন ধরনে গুটিয়ে গেছি সেদিন কলকাতার এই বিশাল বিরূপ সমাবেশে, তার মত্ত দাম্ভিক চালচলনে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমার এক ভাইয়ের মৃত্যু অনিবার্য, ডাক্তারদের কাছে এই কথা জেনে বাবা একদিন ক্লাসে এসে শুনিয়েছিলেন একটির পর একটি 'নৈবেদ্য'র কবিতা। সেই রহস্যময় পড়ন্ত দুপুরের চেয়ে কত ভিন্ন ধরনের রহস্য নিয়ে পৌঁছল কলকাতার জটিল উপদ্রবময় দিনগুলি— গরিব, অসংবৃত, যুধ্যমান!

তবু, এই দুই-ই ছিল সত্যি। এই শূন্য আর প্রত্যক্ষ, পদ্মা আর কলকাতা, কৈশোর আর যৌবন এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়; আর এরই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে জীবন। অথবা কবিতা।

বহিরাগতের ভীরুতা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগল অনেক। কেবল কলকাতাই যে নতুন ছিল তা নয়, আমাদের সামনে তখন খুলে যাচ্ছে নতুন এক আধুনিক জীবন আর কবিতার জগৎ, যার কোনো চিহ্ন জানতাম না আগে। এতদিন শুধু জেনেছিলাম রবীন্দ্রনাথ, তাঁরই কবিতা, তাঁর গান, তাঁর নাটক। আমার আর আমার এক দিদির তখন সব সময়ের বন্ধু-বই ছিল কয়েকখানি রবীন্দ্রস্মৃতিকথা: 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বা 'নির্বাণ'। এসব বইতে পাওয়া রবীন্দ্রজীবনের নানা ছোটোখাটো অনুষঙ্গ নিয়ে আমরা দুজন মশগুল থাকতাম সে-সময়ে। আর, দেখতে দেখতে আমাদের চারপাশে তৈরি হয়ে উঠত যেন এক অলীক বলয়। বিকেলবেলা মাঠের ওপার থেকে বান্ধবীদের আসতে দেখে ফুলদি যখন আধোপরিহাসে হাত ছড়িয়ে গাইতে গাইতে এগোত 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না / শুকনো ধুলো যত', অথবা ইস্কুলফেরত পণ্ডিতমশাই যখন নিজের দাওয়ায় বসে খোলা গায়ে হারমোনিয়ম ধরতেন 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান' আর একটু হেসে বলতেন 'কী রে, শিখবি?' আর নয়তো আমাদের বাড়ির সামনে জ্যোৎস্নাধোয়া আমগাছের নিচে যখন গলা খুলে দিতেন ছোটোমামা 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী / তারে বুঝিতে পারিনি'—তখন গায়ক বা গানকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে সরে যেত মন, জেগে উঠত একটা অলক্ষ্য স্পন্দন, সেই যেন এক অস্ফুট বসন্তসঞ্চার আমাদের জীবনে। সেসব দিনে রবীন্দ্রনাথ

আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এমনি এক ব্যথাময় পৃথিবীর নিবিড়তা, তার ঐশ্বর্যের যেন শেষ ছিল না কোনো।

আর কলকাতা, কলকাতা খুলে দিল সাম্প্রতিকের দরজা। একদিনে নয়, দিনে দিনে। সেখানেও ছিল বহিরাগতের ভীরুতা, জানা ছিল না কোন্‌দিকে আছে পথ। স্টুডেণ্টস হোমের এক মুখলুকোনো ঘর থেকে বাইরে টেনে এনেছিল যে বন্ধু, সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল আমার লেখার খবর, অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের পিছনবেঞ্চ থেকে সামনের দিকে টান দিয়েছিল যারা, তারা কবি ছিল না কেউ, ছিল কবিতার প্রেমিক। তাদেরই হাতে উপহার পেয়ে পেয়ে একদিন আধুনিক কবিদের পৃথিবীতে পৌঁছে গেছি কখন। ছমছমে এক অজানা গুহার সামনে সেই আমাদের সমবেত মুগ্ধতা — আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।

এমনিভাবে একদিন কবিতার দিকে এগোনো গেল ঠিক, কিন্তু এগোনো গেল না কবিতার সমাজের দিকে। আমাদের চেয়ে বড়ো যাঁরা, তাঁদের দিকে তাকিয়ে মনে হলো কোথায় যেন এক নিয়মবৃত্ত আছে, যেন না-লেখা এক কানুন মেনে চলেন অনেকে,কবিতা যেন ভাগ হয়ে আছে মুখ-না-দেখা দুই ভিন্ন শিবিরে। কী নিয়ে লেখা হবে কবিতা ? আমার বাইরের পৃথিবী নিয়ে ? না কি আমারই ব্যক্তিগত জগৎ নিয়ে ? এই ছিল তর্ক, দেশবিদেশের বহুকালের পুরোনো তর্ক। কিন্তু এইদুই কি ভিন্ন নাকি ? এই দুইয়ের মধ্যে নিরন্তর যাওয়াআসা করেই কি বেঁচে নেই মানুষ ? তার থেকেই কি প্রতিমুহূর্তে তৈরি হয়ে উঠছে না একটা তৃতীয় সত্তা ? তাকে সব কথাই বলতে হয় তাই। তবু, না, আমাদের সেই প্রথম পর্বে যেন এক জল-অচল ভাগ দেখেছিলাম দুই প্রতিপক্ষে। এর কোনো দিকেই এগোনো হলো না আর, সরে আসতে হলো যে-কোনো সঙ্ঘ থেকে দূরে।

মরিয়া কোনো ঘরের মেয়ে যদি একদিন ভুখামিছিলে বেরিয়ে আসে পথে,নিষিদ্ধ রেখার ওপারে টেনে নিয়ে সে-মিছিলের কোনো কিশোরীকে যদি হত্যা করে পুলিশ — হঠাৎ তখন ঝলক দিয়ে ওঠে দূরবর্তী তার মায়ের মুখ : দেশব্যাপী যন্ত্রণার সঙ্গেসঙ্গে সেই মৃত্যু তবে কবিতারই কথা হতে পারে। কিন্তু সেই একই সঙ্গে কবিতা হতে পারে কবির নিজের জন্ম, তার জেগেওঠা,

তার অবয়বহীন অভিমানময় ভালোবাসার বিপুল উত্থান, চরাচরব্যাপী বিষণ্ণতায় ধন্ত। এ দুই ভিন্ন নয়, 'এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল'। যদিও সেই মুহূর্তে আমি জানতাম না কোথায় সেই মিল, কীভাবে ধরতে হয় মিল—কিন্তু তার অস্তিত্ব বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না তখন।

এমনসময়ে পৌঁছল এসে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা, তরুণতম কবিদের মুখপত্র হিসেবে ঘোষণা করা হলো তার নাম। 'কৃত্তিবাস'-এর যে কালাপাহাড়ি চরিত্রের কথা বলা হয়, সূচনায় ঠিক তেমন ছিল না তার পরিচয়। তখনো দেখা দেয়নি কোনো তেজী বিদ্রোহ, তখনো সে আকর্ষণ করে আনেনি সমসামাজিকদের কোলাহলময় নিন্দে, কিন্তু তখন থেকেই এর ছিল ভবিষ্যতের দিকে এক নিশ্চিত পদক্ষেপ, ছিল তারুণ্যের আভিজাত্যে ভরা পত্রিকার গৌরব। হিসেববন্ধন বা দলীয়তার বাইরে থেকে 'কৃত্তিবাস' তখন ডাক দিয়েছিল সমস্ত তরুণকে, আমারও জুটল ডাক। এর পর অতিদীর্ঘকাল জুড়ে এই পত্রিকার অবাধ প্রশ্রয় পেয়েছি আমি, এতটাই, যা পাবার হয়তো কোনো অধিকার ছিল না আমার। আর এরই মধ্য দিয়ে প্রাথমিক ভীরুতা একদিন পৌঁছল এসে ভালোবাসায়।

ভালোবাসা? কিন্তু কাকে ভালোবাসা? কোন্ মানুষকে? একটু একটু করে যেন টের পাওয়া যায় যে মানুষের মুখ অনেকসময়েই উলটোদিকে ঘুরোনো; যেভাবে সে আছে, সেভাবে সে নেই। সে যা বলে, ঠিক তা-ই সে বলে না। মানুষের মধ্যে আরেকখানা আরেকখানা আরেকখানা মানুষ, এই নিয়ে তার জীবন অথবা মৃত্যু। এই টুকরোগুলিকে সে হয়তো জুড়ে নেবার চেষ্টা করে প্রাণপণ, কিন্তু তখনই তৈরি হয় আরো একটা নতুন অসংলগ্ন টুকরো। এই টুকরোর কোনো শেষ নেই, তেমনি তাকে লগ্ন করবার চেষ্টারও শেষ নেই কোনো। এইভাবেই চলতে থাকে দিনের পর দিন।

আমারও তেমনি এক টুকরো থেকে অন্য টুকরোয় অবিরাম যাওয়া, পা তোলা পা ফেলার মতো এক কবিতা থেকে আরেক কবিতায় পৌঁছনো। কেবল, বালির ওপর হাঁটছি বলে পিছন ফিরলে দেখা যায় বটে অল্প অল্প পদচিহ্ন। মুহূর্তপরেই তাকে ধুয়ে নিয়ে যায় জল।

১৯৭২

কবিতার মুহূর্ত

হাতে এসে পৌঁছল সেদিন আফ্রিকার একটি কবিতা, নাম : Soweto।
কবিতাটি শুরু হয়েছে এইভাবে :

'আমি কোথায় ? কেন আমি শুয়ে আছি এই ধুলোয় ?'
'হা রে শিশুনারী, কীভাবে বলব আমি
বারো বছরের কাছে যা বলার নয় ?'

এ-রকমই সংলাপধরন নিয়ে চলতে চলতে দীর্ঘ সেই কবিতাটি তুলে আনতে থাকে মর্মান্তিক এক বিবরণ। ট্রান্সভালের এক শহর এই সোয়েটো। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সেখানে শাদা বোয়ারদের 'আফ্রিকান্স' (Afrikaans) ভাষা চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় সরকারি নির্যাতন চলছিল কিছুদিন ধরে। কিন্তু, অন্য কারো ভাষায় শিখব না আমরা, এই প্রতিবাদ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল ইস্কুলের ইউনিফর্মপরা অল্পবয়সীদের এক মিছিল। বারো বছরের একটি মেয়েকে সেখানে গুলি করে মেরেছে পুলিশ। কবিতাটি শুরু হয়েছে মৃত সেই মেয়েটির সঙ্গে অদৃশ্য অলক্ষ্য কোনো কথার পরম্পরায়, কবিতাটির মধ্যে গড়ে উঠেছে তার ছোটোখাটো দিনযাপনের ছবি, তার বা তাদের সমবেত প্রতিরোধের কথা। কবিতার শেষে মেয়েটির আর্তধ্বনির মধ্যে Soweto শব্দটা ভেঙে ভেঙে যায় So-we-to So-we, আর অসমাপ্ত ওই 'we' ধ্বনিতে শেষ হয়ে যায় নিবিড় এই কবিতা।

চমকে ওঠে মন। কবিতার সূচনায় কবি জানিয়েছেন নৃশংস সেই ঘটনার ইতিহাস, ১৯৭৬ সালের ১৬ই জুনের ঘটনা। চমকে ওঠে মন, কেননা হঠাৎ যেন আরো একবার দেখতে পাই সবদেশে সবকালে একই ধাঁচ নিয়ে এসে পৌঁছয় পীড়ন, এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে একটা সেতুই যেন তৈরি করে দেয় তারা। মনে পড়ে, আমাদেরও দেশে এর ঠিক পঁচিশ বছর আগে তো দেখা দিয়েছিল এইরকমই এক ছবি ? পুরোনো দিনগুলোতে ফিরে যায় মন।

সেটা ছিল ১৯৫১ সাল। সকালবেলায় একদিন কাগজ খুলে দেখি, প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হরফে কুচবিহারের খবর : পুলিশের গুলিতে কিশোরীর মৃত্যু। তবে, বারো নয়, সে-কিশোরীর ছিল ষোলো বছর বয়স।

বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা। ক্ষোভেলজ্জায় কাগজ হাতে বসে থাকি এই খবরের সামনে। এক কিশোরী? চার বছর পেরিয়ে গেছে স্বাধীনতার পর, আজও এই খবর? ওয়ান্ মোর্ আন্‌ফর্‌চুনেট্! 'The Bridge of Sighs'এর প্রথম লাইনকটা ঘুরতে থাকে মাথার মধ্যে : ওয়ান্ মোর্ আন্‌ফরচুনেট্! ওয়ান্ মোর্ আন্‌ফর্‌চুনেট্!

চার বছর পেরিয়ে গেছে স্বাধীনতার পর, দেশের মানুষের কাছে তার খবর এসে পৌঁছেছে, কিন্তু খাবার এসে পৌঁছয়নি তখনো। চালডালের আর্জি নিয়ে লোকে তাই কখনোকখনো শহরে এসে দাঁড়ায়, খিদের একটা সুরাহা চায় তারা। তেমনি এক দাবির আন্দোলনে কুচবিহার কাঁপছে তখন। অনেক মানুষের মিছিল চলে এসেছে শহরের বুকে, হাকিমসাহেবের দরবারে।

এসব সময়ে যেমন হয় তেমনই হলো। নিরাপত্তার জন্য তৈরি রইল পুলিশের কর্ডন। নিষিদ্ধ সীমা পর্যন্ত এসে থমকে গেল মিছিল। ঘোষণা আছে যে কর্ডন ভাঙলেই চলবে গুলি, তাই তারা ভাঙতে চায় না নিষেধ। তারা কেবল জানাতে গিয়েছিল তাদের নিরুপায় দশা। তাই নিষেধের সামনে, সারাদিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে পুলিশ আর জনতা।

তারপর ধৈর্য যায় ভেঙে। কার ধৈর্য, তা আমরা জানি না। কিন্তু কাগজে খবর ছিল এই যে, মিছিলের একেবারে সামনে থেকে একটি ষোলো বছরের মেয়েকে কর্ডনের এপারে টেনে নেয় পুলিশ, আর 'অবৈধ' এই সীমালঙ্ঘনের অভিযোগে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তাকে, পথের ওপরই মৃত্যু হয় তার। স্বাধীন দেশের স্বাধীন পুলিশের হাতে স্বাধীন এক কিশোরীর কত অনায়াস সেই মৃত্যু!

এই ছিল খবর। না, আরো একটু ছিল সঙ্গে। ছিল হতভাগ্য সেই মেয়েটির মায়েরও কিছু কথা, তাঁর স্বপ্নের, তাঁর হাহাকারের কথা। সেদিনই, না কি তার পরের দিন? সেটা এখন মনে নেই আর। কিন্তু মনে আছে, বিলাপ করতে করতে বলেছিলেন তিনি, মেয়ের বিয়ের সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল কোনোমতে, কিন্তু কোনো নিষেধ না শুনে কোন্ দুর্মতিতে ওই

সর্বনেশে মিছিলে ভিড়ে গেল সে! কী নিয়ে তাঁর জীবন কাটবে এবার!

এ-খবরের পর কিছুদিন ধরে রাগ আর দুঃখের ধ্বনিপ্রতিধ্বনি শোনা গেল দেশ জুড়ে, ঝড় উঠল বিধানসভায়, ক্ষোভের তীব্রতার মুখে সরকার থেকে তৈরি করে দিতে হলো এক তদন্তকমিশন—এসব সময়ে যেমন হয়। সে-তদন্তের ফল অবশ্য জানা যায় না আর কোনোদিন। তার পর, সময়ের নিয়মে, সবার মন থেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় সব—এসব সময়ে যেমন হয়। মিলিয়ে গেল আমারও।

কলেজ স্ট্রিট বাজারের পিছনদিকে এক গলিতে তখন থাকি আমরা। তিনতলায় একখানা বড়ো ঘর ছিল দাদার রেল-কোয়ার্টার্স, তার দুদিক ঘিরে লোহার জালি দেওয়া বারান্দা। একদিকে উনুন পেতে রান্না করেন মা, অন্যদিকটায় জানলা দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালে চোখে পড়ে রুটির দোকান মাংসের দোকান মাদ্রাসা আর মুদিখানার মধ্য দিয়ে নিচের সচল বস্তিজীবন। আমরা তখন বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছি, ইউনিভার্সিটি শুরু হবে বলে দিন গুনছি শুধু। অলস, মন্থর দিন।

সেইরকম এক দিনের আরেক সকালবেলায়, জানলা দিয়ে নিচের গলিতে তাকিয়ে আছি যখন, রুটিসেঁকার আয়োজনে দোকানি আঁচ তুলছে উনুনে, ময়লাছেঁড়া পোশাকে কটা ছেলেমেয়ে তারই পাশে দুলে দুলে পড়ছে মাদ্রাসায়, বারান্দার পিছনে আমাদের ঘর থেকে ভেসে আসছে আমার ছোটোবোনের ছড়া-আওড়ানো, মা ডাকছেন খাবার জন্য—তখন, যেন একদমকায় ফিরে এল একমাসের পুরোনো সেই কুচবিহারের দিন, ফিরে এল নাম-না-জানা সেই মেয়েটির আর তার মায়ের মুখচ্ছবি, দুলে উঠল কয়েকটি শব্দ: নিভন্ত এই চুল্লিতে মা একটু আগুন দে! যেন তখন শুনতে পাচ্ছি সেই মা আর মেয়ের সমস্ত সংলাপটাই, যেন দেখতে পাচ্ছি তাদের দিনযাপন, যেন শুনতে পাচ্ছি মিছিলের চলার ধ্বনিটাকে পর্যন্ত, মনে হচ্ছে যেন সমস্ত আলস্য কাটিয়ে উঠবার একটা স্পন্দন পাচ্ছি ভিতরে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গিয়ে, কিছুক্ষণের মধ্যে লেখা হয়ে এল কয়েকটা স্তবক। সেই মুহূর্ত থেকে আমার কাছে, নানা ছড়ার স্মৃতি একত্র জড়িয়ে গিয়ে, অদেখা সেই মেয়েটিরই নাম হয়ে উঠল যমুনাবতী, সনাতন বাংলাদেশের কোনো যমুনাবতী সরস্বতী!

যমুনাবতী

One more unfortunate
Weary of breath
Rashly importunate
Gone to her death.

Thomas Hood

নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে !
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী
দু-এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দিই ।

হায় তোকে ভাত দিই কী করে যে ভাত দিই হায়
হায় তোকে ভাত দেব কী দিয়ে যে ভাত দেব হায়

নিভন্ত এই চুল্লি তবে
একটু আগুন দে—
হাড়ের শিরায় শিখার মাতন
মরার আনন্দে !
দু-পারে দুই রুই কাৎলার
মারণী ফন্দি
বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার
মৃত্যুতে মন দিই ।

বর্গী না টর্গী না, যমকে কে সামলায় !
ধার-চক্‌চকে থাবা দেখছ না হামলায় ?
যাস্‌নে ও-হামলায়, যাস্‌নে !

কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না—
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না—
চলল মেয়ে রণে চলল !
বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝন্‌ঝন্‌ করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল !
পেশির দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল।

নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা—
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু-তিনটে গঙ্গা।
দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক্‌ ধক্‌, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি !

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।

নিভন্ত এই চুল্লিতে বোন আগুন ফলেছে !

২

কবিতাটি ছাপা হয়ে যাবার কিছুদিন পরেরও এক স্মৃতি মনে পড়ে, শান্তিনিকেতনের। ১৯৫৩ সালের বসন্ত ছিল সেটা, দুই বাংলার লেখকদের নিয়ে আয়োজন ছিল বড়ো এক সাহিত্যমেলার। লেখক হিসেবে নয়, সে-সভায় থাকবার একটা সুযোগ হয়েছিল ছাত্র-প্রতিনিধি হিসেবে। পাঁচ বছরে আমাদের সাহিত্যকৃতির দিক্‌দিশা নিয়ে আলোচনা চলছে সেই মেলায়, সংগীতভবনের প্রাঙ্গণে, এক সকালবেলায়। বুদ্ধদেব বসু বলবেন সেখানে, জানতাম আমরা। কিন্তু আমাদের হতাশ করে দিয়ে এই জানানো হলো যে বুদ্ধদেব আসরে এসে পৌঁছলেও তিনি বলবেন না কিছু, কেননা ক্লান্ত হয়ে আছেন। পাঁচ বছরের কবিতা নিয়ে তখন প্রবন্ধ পড়ছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। শেষ হবার মুখে, অন্য আরো কবিতাংশের সঙ্গে, পড়ে শোনাচ্ছেন 'যমুনাবতী'-রও কয়েকটি লাইন, হয়তো স্নেহভরেই। কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ঝাঁপ দিয়ে উঠলেন বুদ্ধদেব। একটু আগেই যে বলবেন না বলে ঘোষণা হয়েছিল, ভুলে গেলেন তার কথা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা-রুচির, তাঁর কবিতাবিচারের প্রখর প্রতিবাদ করে বলতে হলো বুদ্ধদেবকে : যে-কোনো হাহাকারকেই কবিতা বলা চলে না। কাকে কবিতা বলে, এই পাঁচ বছরের যথার্থ কবিতা লেখা হয়েছে কোন্‌খানে, তার কিছু বিবরণ বলেন, জীবনানন্দ বা অমিয় চক্রবর্তীর মতো কবিদের বিষয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিরূপ মন্তব্যেরই প্রখর উত্তর দেন তিনি।

আমার লেখাটিও যে এতে আক্রান্ত হলো, সেজন্য আমার ক্ষোভ হয়নি সেদিন। আমাদের সেই অল্পবয়সে, কবিতা কী আর কবিতা কী নয়, এর সিদ্ধান্ত নিয়ে স্পষ্টই একটা শিবিরবিভাজন ছিল, থাকবারই কথা। কিন্তু কবিতা কী, তার কোনো অগ্রিম হিসেব নিয়ে লিখতে চাইনি কবিতা ; এমনকী এও বলা যায় যে, কবিতাই লিখতে হবে এমনও ভাবিনি বেশি। কৈশোর থেকে সেদিন পর্যন্ত, হঠাৎ হঠাৎ লিখতে ইচ্ছে হয়েছে কয়েকটি কথা, যে-কোনো কারণে, আর লিখে গিয়েছি তখন। সে-লেখাকে তো হতে হবে আমারই বোধমতো, আমারই জানা সত্যে। সেটা যদি শেষ পর্যন্ত না পৌঁছয় কোথাও, তাহলে সে তো আমার অক্ষমতা শুধু। সেই অক্ষমতাকে মেনে নিয়ে, জীবন-

টাকে সেদিন ছুঁতে চেয়েছি আমারই মতো।

আবার উলটো অভিজ্ঞতাও হয়। এইসব তুচ্ছ হাহাকারের জন্য যেমন বিমুখ হন কেউ, তেমনি আবার আরেকরকমের লেখা পড়ে কেউ-বা বলেন, এ হলো পালিয়ে যাবার ছল, অন্ধতা, ব্যক্তির আত্মাভিমান। যেখানে শুধু নিজেরই কথা ভাবি, নিজেকে নিয়ে মগ্ন, কেন সেই কবিতা পড়বে কোনো পাঠক? হ্যাঁ, ঠিকই তো, ভাবিও তো নিজেকে নিয়ে অনেকসময়ে। যেমন একদিন হলো, ভিড়ের একটা বাসের মধ্যে। সেও অনেকদিন আগের কথা। বাস থেকে নেমে আসবার চেষ্টা করছি, আর সে-চেষ্টাটার ধরন যে কী হতে পারে, কলকাতার মানুষ তা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। নামবার অল্প আগে থেকে, প্রায় অল্পবয়সের মতোই, বুকের মধ্যে ছোটো একটা কাঁপুনি শুরু হতে থাকে, অনিশ্চয়তার ভয়, অন্যদের বিব্রত করবার ভয়। তবু, নামতে তো হবেই, এসে গেছে স্টপ। একটু কি দেরি হয়ে গেল? দ্রুততার চেষ্টায় রেগে উঠলেন দুচারজন। 'নামবেন তো আগে মনে থাকে না?' 'অত ঠেলছেন কেন মশাই?' 'দেখতে পাচ্ছেন না দাঁড়িয়ে আছি? একটু সরু হয়ে যান না, একটু ছোটো হয়ে যান।'

যথেষ্ট সরুই ছিলাম অবশ্য, তবু লজ্জিত হতে হলো কথাকটি শুনে। অনেকটা কি জায়গা জুড়ে আছি তবে? ক্রুদ্ধ সেই উচ্চারণের সঙ্গেসঙ্গে হেসেও ওঠেন অনেকে, না-হাসতে পারলে তো কলকাতার লোক পাগলই হয়ে যেত। নেমে এলাম পথে, কিন্তু মাথার মধ্যে কেবলই ঝন্‌ঝন্‌ করতে লাগল ওই কটা কথা: সরু হয়ে যান। ছোটো হয়ে যান। কেবলই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে তখন, কথাগুলি যেন স্তর থেকে স্তরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে, ভিড় থেকে দূরে, একারই কোনো কেন্দ্রে, নিজের একেবারে মুখোমুখি।

ভিড়

‘ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
‘সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
‘চোখ নেই ? চোখে দেখতে পান না ?
‘সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান’ –

আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে !
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে ?

৩

ভিড়ের মধ্য থেকে কখনো একার কাছে, একার মধ্য দিয়ে কখনো ভিড়ের কাছে, এপারে ওপারে যাওয়া আসা করে মন। নাম-না-জানা কোনো পথ-চারীর মুখে কতবার পেয়ে যাই কোনো আপাতনিরীহ উচ্চারণ, তার অভীষ্ট ইঙ্গিতটুকু পেরিয়ে গিয়ে বহুরকমের রণন তুলতে থাকে মনে, চেতনা দুলতে থাকে তখন কোনো কবিতার দিকে। কখনো-বা তেমনই ইশারা পেয়ে যাই কোনো শিশুমুখের অবোধ কাকলিতেও।

বেলগাছিয়ায়, ইন্দ্র বিশ্বাস রোডের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছি এক বিকেল-বেলায় মেয়ের হাত ধরে। সাড়ে তিন বছর বয়স তার, পরনে তার শখের একটা লাল নিকারবোকার, হাঁটতে হাঁটতে বলছে কেবলই: 'একটা গল্প বলো।' অনেকসময়ে এমন হয় যে শরীরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট স্রোত টের পাচ্ছি, ভাঙতে ইচ্ছে করছে না সেই স্রোত, হয়তো কোনো লেখাই হয়ে উঠবে মনে হয়। সেইরকম একটা সময় তখন, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না একে-বারে। মেয়েকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্য বলি: 'গল্প? আগে তুমি বলো একটা, তারপর আমি।' 'আমি বলব?' একটু এদিক-ওদিক তাকায় সে। তারপর হঠাৎ শুরু করে: 'আজকাল—' 'হ্যাঁ, আজকাল—তারপর?' 'আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না।' 'বনে' শব্দটার ওপর একটু চাপ দিয়ে বলল সে এই লাইন। 'থাকে না? কোথায় থাকে?' 'কলকাতায় থাকে।'

কথাটা শপাং করে লাগল আমার মাথায়। হয়তো 'আজকাল' শব্দটাই এই কাণ্ড করল। মেয়ে গল্প বলতে থাকে তার আপন মনে, কিন্তু আমি কেবল দু-একটা অস্ফুট সায় দিয়ে সরিয়ে রাখি মন। কলকাতার জঙ্গলটা ভেসে ওঠে চোখে। কদিন আগেই খবর শুনেছি এক বাস্তুহারা পরিবারের মেয়েকে নিয়ে গেছে কারা, আর্ত হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার মা, তার প্রেমিক। কিন্তু পুলিশ বলে: কতই তো হচ্ছে ওরকম। দেখুন, হয়তো নিজেই পালিয়েছে!

গল্প বলতে থাকে মেয়ে, আমি কেবল তার হাত আরো শক্ত করে ধরি, একলাইনও শুনি না আর, শুধু বলি: 'তারপর?' আর মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকে শুধু: কলকাতায় থাকে, আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না, কলকাতায় থাকে!

বাস্তু

আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না,
কলকাতায় থাকে।
আমার মেয়েকে ওরা চুরি করে নিয়েছিল
জবার পোশাকে!
কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?

শুধু ওই যুবকের মুখখানি মনে পড়ে ম্লান,
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ও কেন গলির কানা বাঁকে
এখনো প্রতীক্ষা করে তাকে!

সব আজ কলকাতায়, কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?

৪

শেষ হয়ে আসছে ১৯৬৬ সাল। প্রায় কুড়ি বছর হতে চলল নতুন দেশের, কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে ভরসা হয় না যে তৈরি হয়ে উঠছে কোনো ঐক্যময় নতুন সমাজ। ভাঙনে ভাঙনে কি ভরে এল সব? কোনো কি লক্ষ্য আছে আমাদের এই দিশেহারা সংস্কৃতির? কিছু একটা করবার ছিল, কিছু একটা করবার ছিল, মনে হতে থাকে।

এইরকম এক সময়ে, বন্ধুবৃত্তে একটা কথা ওঠে: লেখার সঙ্গে শিল্পের জগতের কোনো একাত্মতা নেই কেন, কেন কোনো চলাচল নেই এক সৃষ্টি থেকে অন্য সৃষ্টিতে? যাঁরা ছবি আঁকেন, যাঁরা কবিতা লেখেন, গল্প লেখেন যাঁরা, নিজেদের মধ্যে তাঁদের মেলামেশা আলাপসংলাপ আরো একটু ঘন হলে হয়তো কেটে যেতে পারত এই জড়তা, হয়তো তখন এর কাছে ওর, ওর কাছে এর প্রেরণাও মিলতে পারত কিছু।

তাই ঠিক হলো, এক-একজনের বাড়িতে এক-একদিন মিলব আমরা সবাই, নিছক আড্ডারই জন্য, আর সেইসঙ্গে হয়তো শিল্পবিষয়ে সামান্য কিছু কথাও হতে পারে। অনেকে মিলে বসা হলো একদিন। কথা কখন সরতে সরতে ফিরে গেছে অতীতদিনে, উঠে এসেছে ভারতীয় ছবির ইতিহাস, অবনীন্দ্রনাথের নাম, ওরিয়েন্টাল আর্টের কথা। ওরিয়েন্টাল শব্দটি থেকে এই প্রশ্নও উঠছে: শিল্পের মধ্যে জাতীয়-চিহ্ন খুঁজবার মানে আছে কিছু? শিল্প কি স্বভাবতই আন্তর্জাতিক নয়? ভারতীয়ের আঁকা ছবিতে, ভারতীয়ের লেখা কবিতায় বিশেষ-কোনো ভারতীয় লক্ষণ যে চাই, এ কি কোনো অযৌক্তিক সংকীর্ণতার দাবি নয়? এ কি নয় অনাধুনিক? আলোচনায় শেষ পর্যন্ত এই মতেরই জোরালো প্রতিষ্ঠা হলো যে ভারতীয়তা একটা অলীক ব্যাপার, তার অস্তিত্ব নেই কোথাও।

হয়তো তা-ই। কিন্তু একথার একটা প্রতিবাদ উদ্‌গত হয়ে উঠছিল মনে। মনে হচ্ছিল কোথাও কোনো ভুল হয়ে যাচ্ছে: আছে, কিছু আছে। সমাবেশের মধ্যে কথাবলার অনভ্যাসে, জড়তায়, বলতে পারিনি সেকথা, ভিতরে ভিতরে তাই জমে উঠছিল একটা অসম্পূর্ণতার কষ্ট।

ভেঙে গেল সেদিনকার বৈঠক। অনুচ্চারিত সেই তর্ক নিয়ে বেরিয়ে

এসেছি পথে, অন্তদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে রাতের পথে ঘুরছি একা একা। বলতে পারিনি, বলতে পারিনি কিছু। পার্ক স্ট্রিটের নৈশযাত্রীদের পিছনে রেখে চৌরঙ্গীর রাত্রি পেরিয়ে হেঁটে চলেছি উত্তরের দিকে। আরো কিছু দূরে এসে চোখে পড়ে শেয়ালদায় গৃহমুখী মানুষের চলচ্ছবি, কবিতার লাইন ভেসে আসে : **death has undone so many** ! কাদের এ মুখ ? কোন্ দেশের মানুষ এরা ? এদের কোনো নিজস্ব পরিচয় কি আছে ? ওই পার্ক স্ট্রিট আর এই শেয়ালদা, এ কি একই দেশের ? কোথায় আছে এরা, জানে কি তা সবাই ? এরা, আমরা, কোনো কি শিকড়ে বাঁধা আছি কোথাও ? কোন্ আন্তর্জাতিক মানুষ তুমি, কী তোমার ভাষা, কী তোমার জীবন, কোনো কি ঘর আছে তোমার ?

আরো উত্তরে হাঁটছি। বলতে পারিনি, বলতে পারিনি কিছু। মনে পড়ছে অনেকদিনের অনেক হাঁটা, সেই-বাংলা থেকে এই-বাংলায়। কোথায় চলেছি ? চকিতে মনে পড়ছে আত্মপরিচয়হীন এক সত্যকামের কথা, উপ-নিষদের কাহিনী, মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ'। জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে ! আমরাও কি নই তা-ই ? কিছু কি করার নেই আমাদের ?

একটি লেখা উঠে আসতে থাকে, এর অল্প কদিন পর, না-বলা সব কথার স্রোত নিয়ে।

জাবাল সত্যকাম

আচার্য বললেন, এমন বাক্য ব্রাহ্মণেই সম্ভব। হে সৌম্য, সমিধ আহরণ করো, তোমায় উপনীত করব, কারণ সত্য থেকে তুমি ভ্রষ্ট হও নি। ক্ষীণ ও দুর্বল গোধনের চারশো তাকে পৃথক করে দিয়ে বললেন, অনুগমন করো। বনাভিমুখে তাদের চালিত করে সত্যকাম জানালেন, 'সহস্র পূর্ণ না হলে আমি ফিরব না।' ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।৪

তুমি দিয়েছিলে ভার, আমি তাই নির্জন রাখাল।
তুমি দিয়েছিলে ভার, আমি তাই এমন সকালসন্ধ্যা
আজানু বসেছি এই উদাসীন মর্যাদায়
চেয়ে আছি নিঃস্ব চোখে চোখে।
এ কি ভালোবাসে ওকে ? ও কি একে ভালোবাসে ?
আমারই দু-হাতে যেন পরিচর্যা পায়
ভালোবাসাবাসি করে। যখন সহস্র পূর্ণ হবে
ফিরে যাব ঘরে
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
আয়তনবান এই দশ দিক বায়বীয় স্বরে
ফিরে নেবে ঘরে
এখন অনেকদিন বন্ধুদল তোমাদের হাতে হাতে নই
এখন স্পষ্টই
আমার আড়াল, বনবাস।

২

ভাবো সেই সন্ধ্যাজাল অস্ফুট বাতাস আমি আভাময় পায়ে হেঁটে গেছি
পাথরবিছানো পথে পথে
তোমার দুঃখের পাশে দীক্ষা নেব ইচ্ছা ছিল কত
প্রেমের পল্লব সর্বঘটে
ভেবেছি এত যে দল, দল দল, আমারও কি জায়গা নেই কোনো ?
মাঠের বিপুল ভেঙে দোলানো লণ্ঠন যায়, দূরে সরে বালকের স্মৃতি
প্রধান সড়কে আমি, আমারও কি জায়গা নেই কোনো ?

পদ্মার তুফান দেয় টান নৌকো খান্ খান্
পেরিয়ে এসেছি কত সেতু
তোমার দুঃখের পাশে বসে আছে জনবল চোখে রুপা ইলিশের দ্যুতি
আমিও প্রণাম করি বুকে লাগে শ্যামল বিনয়ভূমি, তুমি
মাথায় রেখেছ হাত স্নেহভরে, বলো
‘কী তোমার গোত্রপরিচয় ?’

পরিচয় ?   কেন পরিচয় চাও প্রভু ?
ওই ওরা বসে আছে অন্ধকার বনচ্ছায়ে সকলেই ঋদ্ধপরিচয় ?
বনে ভরে আগুনকুসুম—
আপন সোপানে কারা জলস্রোতে দেখেছিল মুখ ?
বুকে জ্বলে আগুনকুসুম—
আমি যে আমিই এই পরিচয়ে ভরে না হৃদয় ?
কেন চাও আত্মপরিচয় ?
কোথায় আমার দেশ কোন্ স্থিতি মৃত্তিকার কুল
কোন্ চোখে চোখ রেখে বুকের আকাশ ভরে মেঘে
দেশদেশান্তর কালকালান্তর কোথায় আমার ঘর
তুমি চাও গোত্রপরিচয় !
পিছনে পিছনে এত বাঁধা আছে হৃদয়ের মানে আর
শিকড়ে শিকড়ে জমে টান
গঙ্গা এত বহমান দীর্ঘ দেশকাল জুড়ে আমারও হৃদয়
ধুলোপায়ে ফিরে বলে কোথায় আমার গোত্র
কী আমার পরিচয় মা ?

ছুটে সরে যাই দূরে ঘরে পরে সদরে অন্দরে
কী আমার পরিচয় মা
শহরে ডকে ও গ্রামে ফুলে ওঠে পরিশ্রম গাছে ওড়ে রঙিন বেলুন
কী আমার পরিচয় মা
ধরো নদীতীর শোনো শব্দ যেন জমে ছিল জাহাজের সারি

জেটিতে জুটায় ভালোবাসা
টন টন শস্যে মুখ ঢেকে যায় রৌদ্রহীন শস্যের শরীর গলে যায়
কী আমার পরিচয় মা
পোশাকের নিচে আমি আমার ভিতরে জমে নির্বোধ পোশাক
আমার দেহের কোনো পরিত্রাণ থাক না-ই থাক
মুখে ঠিক উঠেছিল গ্রাস
কী আমার পরিচয় মা
দারুণ কুঠারে কেউ ছিঁড়ে দিয়েছিল দড়ি
দ্রুত খুলে যায় সব তরী
টেবিলে গেলাস রেখে উঠে আসে প্রণয়িনী হাত ভাঁজ করে বলে, এসো,
কনুই বাঁকিয়ে ওরা মিশে যায় ক্রিসমাস ভিড়ে
টুইস্ট টুইস্ট টুইস্ট
কিছুতেই কিছু নয় ললাটে না ভাষায় না
নতনীল বুকে কিছু নয়
আমার জিভের বিষে ঝরে যায় জরতী ভিখারি
সব গাড়ি থেমে থাকে রমণীর রক্তিম নখরে
কী আমার পরিচয় মা ?

৩

বহুপরিচর্যাজাত আমি, প্রভু, পরিচয়হীন ।
ওরা হাসাহাসি করে, মুখে থুতু দেয়, ঢিল ছুঁড়ে মারে, আমি
পরিচয়হীন
জলস্থল সর্বতল আমার বিলাপে কাঁপে পরিচয়হীন ।

গোপনে আপনভূমি ক্ষয়ে যায় কবে
যেমন চোখের আড়ে সরে যায় বসন্তবয়স আর
পিয়ানোর পিঠে জমে ধুলো
যেমন উত্তান রাত কেঁপে ওঠে মহোৎসবে নীল
হাতে হাত ছুঁয়ে গেল বিষ হয়ে ফুলে ওঠে শিরা ও ধমনী, ওরা বলে

কিছুতেই কিছু নয় ভাষায় না পোশাকে না মুখের রেখায় কিছু নয়,
কী-বা আসে যায়
বুকের তোরণে কোনো স্বাগতম্ রাখেনি যুবতী
কী সুন্দর মালা আজ পরেছ গলায়
আজ মনে পড়ে মাগো তোমার সিঁদুর এই নিখিল ভুবনে
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে
ভাষায় না পোশাকে না মুখের রেখায় নয় চোখের নিহিত জলে নয়
আমি খুব নিচু হয়ে তোমার পায়ের কাছে বলি, আজ ক্ষমা করো প্রভু
আয়তনহীন এই দশ দিকে আজ আর আমার দুঃখের কোনো ভারতবর্ষ নেই।

বহুপরিচর্যাজাত পথের ভিক্ষায় জন্মদিন
প্রভু এই এনেছি সমিধ
অন্ধকার বনচ্ছায়ে দীর্ঘ তালবীথি সত্যকাম
এনেছি সমিধ
আমার শরীর নাও দুই হাতে পুঁথি ও হৃদয়
তুমি চাও আত্মপরিচয়
শস্যময় ভালোবাসা প্রান্তরে নিহিত বর্তমান
আমার তো নাম নেই, তুমি বলেছিলে সত্যকাম।

এখন স্পষ্টই
আমার আড়াল, বনবাস
এখন অনেকদিন বন্ধুদল তোমাদের হাতে হাতে নই।
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
ফিরে যাব ঘরে
যখন সহস্র পূর্ণ হবে
আয়তনবান এই দশ দিক গাঢ়তর স্বরে
ফিরে নেবে ঘরে
এখন আজানু এই উদাসীন মাঠে মাঠে আমার সকাল
তুমি দিয়েছিলে ভার আমি তাই নির্জন রাখাল।

৫

বিদেশ থেকে ফিরে এসেছি তখন, আটষট্টি সাল, পুজোর ছুটিতে কদিনের জন্য যাব জলপাইগুড়ি।

অন্য দেশের মানুষেরা, এমনকী এদেশেরও প্রবাসী যাঁরা ওখানে, তাঁরা কী-চোখে দেখেন আমাদের, তার কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় জেনেছি ততদিনে। দেশের যে সমালোচনা শুনি তার সবটাই যে মিথ্যে তা নয়, কিন্তু সেইজন্যেই আরো তীব্রভাবে মনে হতে থাকে : কীভাবে বাঁচব আমরা? তবে কোথায় আমাদের ভুল? আমাদের এইসব লেখালেখির, এইসব জীবনযাপনের, মানে আছে কিছু?

লক্ষ্মীপুজোর ঠিক আগের দিন এসে পৌঁছই জলপাইগুড়িতে। আবহাওয়া ভালো নয়, সারাদিনই বৃষ্টি চলছে, আর গমকে গমকে বাতাস। অনেক রাতে সবাই মিলে খেতে বসেছি যখন, বুক পর্যন্ত শব্দ তুলে একটা গাছ পড়ল ভেঙে। রান্নার ঠাকুর বলে ওঠে : এ একেবারে বানডাকা বাদল! আর আমাদের মনে হয় : ঘুম হবে ভালো।

হচ্ছিলও তাই। কিন্তু রাত তিনটের সময়ে এক অস্পষ্ট সোরগোলে যখন ভেঙে গেল ঘুম, তাকিয়ে দেখি ঘরের মধ্যে জল। করলা-র জল? না, উঠোনের গলাজল ঠেলে উদ্‌ভ্রান্ত প্রতিবেশীরা চলে আসতে চাইছেন এদিকে —কেননা এই পাকাবাড়ির দোতলায় ঘর আছে দুখানা—বাঁধ ভেঙেছে তিস্তার। বৃষ্টি চলছে তখনো।

সবাই মিলে উঠে এসেছি দোতলায়, চল্লিশ জন মানুষ আর একটা গরু। ওপরে বসে দেখছি, ঝলকে ঝলকে বেড়ে চলেছে জল। কতটা আরো বাড়বে, বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। দোতলা পর্যন্তই কি চলে আসতে পারে? ছাতের কোনো সিঁড়ি নেই, তবুও কোনো পদ্ধতিতে ওঠা যায় কি না সেখানে,গোপনে দু-একজন পরীক্ষা করে দেখছি।

বৃষ্টি থেমেছে। অন্ধকার কাটেনি তখনো। চারদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে নদীর ওপরে ভাসছি আমরা ভেলায়। কিন্তু দূরে ওই কী-একটা ভেসে যাচ্ছে না জলে? কোনো কাঠের টুকরো? কোনো মৃত পশু? মানুষই নয় তো? কারো মাথা? ঝাঁপিয়ে পড়লেন একজন, সাঁতরে গিয়ে ধরে আনলেন ভাসমান

সেই মাথা : আমাদের সঙ্গে এসে জুটল আরো একজন সঙ্গী, হতচেতন এক কিশোর। পরিচর্যায় জ্ঞান ফেরানো হলো তার। চায়ের এক দোকানে কাজ করে সে। ঝাঁপ বন্ধ করে শুয়েছিল রাতে, তারপরে আর তার জানা নেই কিছু।

দোতলা থেকে কয়েক ইঞ্চি নিচে এসে থেমে যায় জল, ওঠে না আর। কিন্তু নামেও না সহজে। সকাল হয়ে আসে। বৃষ্টি ধরে যায়। আর, কী আশ্চর্য, এতই সরে গেছে মেঘ, আকাশ এতই ঝকঝকে যে বাঁদিকে তাকালেই দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা, জলপাইগুড়ি থেকে যে-দৃশ্য খুব সুলভ নয়। পায়ের তলায় জল, আকাশের গায়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

জল নামছে সারাদিন ধরে। কেবল জলেরই কথা নয়, ওপরেই বন্দী আছি সারাদিন, সারাদিন ধরে ভাবি কোথায় আমাদের ভুল। ভাবি, এখানে তো দোতলা আছে। যাদের তা নেই? আর এ-শহরে সবই তো প্রায় তেমন। কীভাবে আছে তারা? কোথায়? সন্ধ্যায় সবাই ট্রানজিস্টার কানে ধরে থাকে উৎকণ্ঠায়, সাহায্যের কোনো খবর এসে পৌছবে হয়তো। এই তো, স্থানীয় খবর শুরু হলো আকাশবাণীর। কিন্তু না, খবর নেই কোনো। আমরা কেবল জানলাম, ধ্বস নেমেছে দার্জিলিঙে।

খবর পৌছল পরের দিন। তখন আমরা কেউ কেউ নামতে পেরেছি নিচে, ঘরের মধ্যে শুধু একহাঁটু পলিমাটি। শহর পরিক্রমায় বেরোই, ক্ষয়ের ধারণা নিই কিছু। ভেঙে গেছে করলার ব্রিজ। এখানে-ওখানে দেখতে পাই মৃত শরীর, পশুর, মানুষেরও কখনো-বা, এক হয়ে আছে সব। কার দোষ? কার? শুনতে পাই চরের বসতি থেকে এক-লহমায় মিলিয়ে গেছে হাজার হাজার লোক।

কী করে ভাঙল বাঁধ? বাঁধ তো ভাঙতেই পারে, মানুষেরই তো তৈরি সে-বাঁধ। সতর্কতা কি ছিল না কোথাও? ছিল, তাও ছিল। সন্ধেরই মধ্যে না কি জানা গিয়েছিল এই বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। শহরে সেটা ইচ্ছে করেই জানানো হয়নি তখন, ত্রাস ছড়ানো ভালো নয় ভেবে।

মানুষকে নিঃশঙ্ক করবারই এই আয়োজন!

শিলিগুড়ি থেকে ত্রাণ এসে পৌছয়। কদিন ধরে চলতে থাকে নতুন

প্রতিষ্ঠায়, সংস্কারের কাজ। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন শুনতে পাই, রিলিফের কাজে সরকারি অব্যবস্থা নিয়ে তর্ক তুলতে গিয়ে মিলিটারির বেয়নেটের সামনে বুক খুলে দাঁড়িয়েছিল দেবেশ।

অল্পে অল্পে আত্মস্থ হতে থাকে শহর, কলকাতায় ফিরবার কথা ভাবছি, পথে দেখা হয়ে যায় রণজিৎ আর ছায়ার সঙ্গে, ক্ষোভে দুঃখে রাগে ওদের অঞ্চলের ভয়াবহতার বিবরণ শোনায়। ছায়া বলে, চলে যাবার আগে, : লিখুন, এসব কথা লিখে জানান আপনারা। লোকে কি আর মনে রাখবে কিছু? লোকে তো দুদিনেই ভুলে যাবে সব।

চলে যায় ওরা, কিন্তু কথাটা ঘুরতে থাকে মাথায় : লোকে ভুলে যায়, লোকে ভুলে যেতে চায়। সত্যি? সত্যি কি ভোলে?

হয়তো-বা ভোলে। পনেরোদিন পর ফিরে এসেছি যে-কলকাতায়, সে ছিল দেওয়ালির কলকাতা। উৎসবে আর আলোর গমকে উথালপাথাল শহর, বাজিপোড়ানোয় সেবার নাকি রেকর্ড করেছিল সে। বৌবাজারের পথে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকার আকাশে ফুলঝুরির মস্ত বাহার দেখে মনে পড়ে যায় সন্থদেখেআসা শকুনে-খাওয়া মৃত মহিষের শরীর।

দেশের এ-প্রান্তের সঙ্গে ও-প্রান্তের কি মর্মের যোগ আছে কোনো? হয়তো আজই এসে পৌঁছলাম বলে এ-বৈপরীত্য এমন কঠোর হয়ে লাগছে চোখে, তা নইলে তো আমারও বোধে আসত না এত অসংগতি! কীভাবে তবে বাঁচব আমরা? কোথায় আমাদের ভুল? শহরের এই আনন্দচ্ছবি দেখতে পাই। দেখে এসেছি প্রবাসী মানুষদের কারো কারো অকরুণ নিস্পৃহতা। তিস্তার বাঁধ ভেঙে গেছে। আরো আগে ভেঙে গেছে আমাদের সর্বস্বের বাঁধ। মনের মধ্যে সবকিছু জড়িয়ে যেতে থাকে। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের পুরাণ, আমাদের অভিজ্ঞতা। প্রতিরোধ কি নেই কোথাও? মনে হয় না তা। বন্দুকের নলের সামনে বুক রেখে দাঁড়াতেও পারে কেউ। মনে পড়ে আরুণির গল্প। এখনো কি নেই কোনো আরুণি? সবাইকে কি বলি দিতে নিয়ে গেছে তৃষ্ণাদেবতার বেদিমূলে?

টুকরো টুকরো এইসব কথা জমতে থাকে মনে, কয়েকদিন ধরে। তারপর, ডিসেম্বরের একটা দিনে, অনেকে মিলে বিষ্ণুপুর যাবার পথে, দুর্গাপুরের

এক হোটেলঘরে খুশিতে যখন মেতে আছি সবাই, চমক দিয়ে মনে ফিরে এল জলপাইগুড়ির ছবি আর ছায়ার সেই ক্ষোভ : লোকে তো দুদিনেই ভুলে যাবে সব !

কিন্তু আমিও কি যাইনি ভুলে ? তবে কি আমিই ভুলে যাই ?

কোনো একটা কবিতার প্রথম লাইন পেয়ে গেছি, মনে হলো। কয়েক সপ্তাহ জুড়ে ভরেওঠা কথাগুলি কলমের মুখে পৌঁছতে লাগল তারপর, দুর্গাপুরের ছোটো সেই হোটেলঘরে। পশ্চিমের কাছে ভিখারি হয়ে দাঁড়ানো আমাদের এই সর্বার্থে ঋণগ্রস্ত দেশের ঘুণেধরা জীবন, আমাদের নিষ্ক্রিয়তার আমাদের অভিমানের অবসরে প্লাবন হয়ে ছুটে-আসা বাঁধভেঙেদেওয়া এক ধ্বংসের ছবি, আর দূরের অলক্ষ্যে তৈরি-হতে-থাকা কোনো আরুণি আর সুমনদের কল্পনা ভরে তুলতে লাগল সেই ঘর।

আরুণি উদ্দালক

আরুণি বললেন, আমি জ্ঞানার্থী। গুরু আদেশ করলেন, যাও, অ মার ক্ষেত্রের আল বাঁধো। পরে তাঁর ব্যাকুল আহ্বানে উঠে এসে বললেন আরুণি, জলপ্রবাহ রোধ করতে না পেরে আলে আমি শুয়ে ছিলাম, এখন আজ্ঞা করুন। ধৌম্য জানালেন, কেদারখণ্ড বিদারণ করে উঠেছ বলে তুমি উদ্দালক, সমস্ত বেদ তোমার অন্তরে প্রকাশিত হোক। পৌষ্য পর্বাধ্যায়, আদিপর্ব, মহাভারত।

তবে কি আমিই ভুলে যাই ? দিকচক্রবাল শুধু বাসা বানাবার অন্য ছল ?
তবেকি অস্তিত্ব বড়ো অস্তিত্বের বেদনার চেয়ে ? কার বাসা ? কতখানি বাসা ?
তোমার সমগ্র সত্তা যতক্ষণ না-দাও আমাকে
ততক্ষণ কোনো জ্ঞান নেই
ততক্ষণ পুরোনো ধ্বংসের ধারে অবসন্ন শরিকের দিঘি।
নীল কাচে আলো লেগে প্রতিফলনের মতো স্মৃতি, রাজবাড়ি
কবুতর ওড়ানো চত্বর
ভাঙা গ্রামে পড়ে আছো, শোনো
তবু একজন ছিল এই ধুলাশহরে আরুণি
সে আমাকে বলে গিয়েছিল আল বেঁধে দেবে সে শরীরে।

আমি গুরু অভিমানে বসে আছি সেই থেকে, দিন যায়—রাত
আবার রাত্রির পরে দিন, অস্পষ্ট দু-হাত
নেমে আসে জানুর উপরে
জানা ও কাজের মধ্যে বহু সেতু, দেখাশোনা নেই
ঘরে ঘরে সকলেই নিঃসঙ্গ প্রস্তুত করে লক্ষ্মী-উপাসনা
যে যার আপন সুখে চলে যায় পূর্ণিমার দিকে
আমার নিঃশীল বসে থাকা
বিকল্প বন্ধুতা দেয় ঘটে জমে-থাকা জল অলস মন্থর
হৃদয়ের কাছাকাছি মুখ নিলে ঘুরে যায় পাঁচটি পল্লব পাঁচ দিকে
আর সেই অবসরে ফেটে যায় জলস্রোত, কেননা প্রকৃতি নাকি শূন্যের বিরোধী।

হাঁটুজল বুকজল গলাজল
শান্তিজল হয়ে ওঠে নীলজল পীতজল গলাজল
ঘট ভেঙে আমাদের ধরে ফেলে অতর্কিতে ভাসমান শূন্যের বিরোধী
মধ্যরাত ছুঁড়ে দিলে নিজের পায়ের ভর খুলে যায় পঞ্চশীলময়
আর সেই অবসরে ছোটে বাণিজ্যের ঢেউ ছলনা প্রস্তুত থাকে দিগন্ত অবধি
যে-কোনো আঘাত লেগে উড়ে আসে চালচিত্র ধ্বসে যায় প্রাচীরের তল
কে কোথায় আছো বলে টলে পড়ে যায় সব কবুতর ভাঙা রাজবাড়ি
তোমাদের হাতেগড়া একাল-ওকাল-জোড়া ব্রিজগুলি ঝলকে মিলায়
পাশের বাড়ির বৌ শেষরাতে অন্ধকার ডানা ঝাপটায় খোলা স্রোতে
এদিকে সকাল আসে প্রায় পরিহাসময় কাঞ্চনজঙ্ঘার যোগ্য রুপালি ঠমকে।

বলে গিয়েছিল বটে, আছে কি না-আছে কে বা জানে
ভুলে যায় লোকে।
আবার সমস্ত দিক স্থির করে জল
এ-ও এক জন্মাষ্টমী যখন দু-হাত-জোড়া নীলশিশু হাতে নিঃস্ব দেহ
জল ভেঙে যায়
আলোর কুসুমতাপে ছড়ানো গো-কুল
যে-কোনো যমুনা থেকে পায়ে বাজে বিপরীত চৌকাঠে জড়ানো তিন বোন
মুহূর্তের তুড়ি লেগে উড়ে যায় সমূহ সংসার
কেননা দেশের মূর্তি
কেননা দেশের মূর্তি দেশের ভিতরে নেই আর!

গড়ে তুলবার দিকে মন দেওয়া হয়নি আর কী
সহজেই বাঁধ ভেঙে যায়
চেতাবনী ছিল ঠিক, তুমি-আমি লক্ষই করিনি
কার ছিল কতখানি দায়
আমরা সময় বুঝে ঝোপে ঝোপে সরে গেছি শৃগালের মতো
আত্মপতনের বীজ লক্ষই করিনি
আমার চোখের দিকে যে ভিখারি হেসে যায় আমি আজ তার কাছে ঋণী

এত দ্বিধা কেন বলে লাঞ্ছনা করেছে যারা তাদের সবার কাছে ঋণ
অবনত দিন
ভাবে, একা বাঁধ দেবে, তা কি কখনোই হতে পারে ?
আমাদের বিশ্বাস ঘটে না
আমাদের ঘরে ঘরে প্রতি পায়ে জমে ওঠে পলি
আর অলিগলি
আতুর বৃদ্ধের হাতে খুঁজে ফেরে হারানো শরীর
আমাদের ঠোঁটে ওঠে হাসি
দুপুরে বাতাসভরা কেঁপেওঠা অশথের পাতা
যেমন নির্জন শব্দ তোলে
এখনো অম্বার স্বর ততখানি ঝরে পড়ে 'সুমন, সুমন'
আমাদের চোখে ভাসে সাবেক করুণা
অথবা কখনো
নিজেরই অথর্ব দেহ যেমন ধিক্কারে টেনে প্রতি রাত্রিবেলা
তোমার মুক্তির পায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই
তেমনই দূরের জলে দিয়ে আসি মৃত গাভী গলিত শূকর আর তোমাকেও মা
মুখে যে আগুন রাখি তত পুণ্য রটে না আমার
মৃত্যুশোকে কার অধিকার
কেবল অম্বার কণ্ঠ এখনো নদীর জলে 'সুমন, সুমন'
আর আমি বলে উঠি এসো এসো উঠে এসো উদ্দালক হও
স্পষ্ট হও, বাঁচো –
শুধু মূর্খ অভিমানে বসে থেকে জলস্রোতে কখন যে আরুণি সুমন
তৃষ্ণাদেবতার মূলে একাকার হয়ে যায় তা আমার বোধেও ছিল না।

কখনো চোখের জল হয়ে ওঠে সোনা
কিন্তু কখন ? সে কি এই আচ্ছন্ন বিলাপে ?
দীর্ঘ আলপথ ঘুরে এই কুব্জ ক্যারাভান তোমার দুয়ারে এসে ভিখারি দাঁড়ায়
আর তুমি

শোকের আতসগড়া তুমি কী সুন্দর মজ্জাহীন
রাত্রিগুলি ওড়াও আকাশে
বণিকের মানদণ্ড মেরুদণ্ড বানাও শরীরে
বেতন জোগাও চোখে প্রত্যহযাপনছলে রাজপথে অন্ধকার ঘরে
তখন ?
হে নগর, দীপান্বিতা ভাস্বতী নগরী
আকণ্ঠ নাগরী
মহিষের ধ্বস্ত দেহে যত লক্ষ রক্তবিন্দু জ্বালায় শকুন
তোমার রাত্রির গায়ে তার চেয়ে বেশি ফুলঝুরি
পোহালে শর্বরী
তোমারই প্রভাতফেরী মেতে ওঠে ত্রাণমহোৎসবে।

হবে, তাও হবে। মাথা খুব নিচু করে সবুজ গুল্মের ছায়া মুখে তুলে নিলে
ওর দেহ হয়ে ওঠে আমাদেরই দেহ. তাছাড়া এ অভিজ্ঞতার
অন্য কোনো মানে নেই
যখন আঙুল থেকে খুলে পড়ে নির্মল নির্ভর
তখনো দুখানি হাত দুঃখের দক্ষিণ পাশে স্থির রাখা
আরো একবার ভালোবাসা
এই শুধু, আর কোনো জ্ঞান নেই
আর সব উন্নয়ন পরিত্রাণ ঘূর্ণমান অগণ্য বিপণি দেশ জুড়ে
যা দেয় তা নেবার যোগ্য নয়
আমাদের চেতনাই ক্রমশ অস্পষ্ট করে সাহায্যের হাত
আছে সব সমর্পণে — এমন-কী ধ্বংসের মধ্যে — আবার নিজের কাছে
ফিরে আসা, বাঁচা। তাই
যে বলেছে আজও এই প্লাবনে সংক্ষোভে মেঘে আমার সমস্ত জ্ঞান চাই
সে বড়ো প্রত্যক্ষ চোখে আপন শরীর নিয়ে বাঁধ দিতে গিয়েছিল জলে —

লোকে ভুলে যেতে চায়, সহজেই ভোলে।

৬

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টও হয়ে গেছে তখন। আর অন্যদিকে, এ-গ্রামে ও-গ্রামে ঢুকে পড়ছে বিপ্লবী ছেলেরা, সব ছেড়ে দিয়ে, কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে লড়াই করতে চায় তারা। বহু দেশের উন্মাদনার ছোঁয়া লাগে তাদের গায়ে, সামনে তাদের নতুন সমাজের নতুন জন্মের স্বপ্ন। কিন্তু এদের স্বপ্নে ওদের পদ্ধতিতে মিল হয় না বলে কত আত্মক্ষয়ী সর্বনাশে ভরে থাকে সময়!

তারই জটের মধ্যে আমরা শুধু দিনযাপন করে যাই।

এই নিছক যাপনের গ্লানি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি বীড্‌ন্‌ স্কোয়্যারের পাশ ধরে নিমতলা পর্যন্ত, নিরুদ্দেশ এলোমেলো ঘোরা। মৃত্যুতীরের জলের রং দেখতে দেখতে মনে পড়ে কিছুদিনের পুরোনো ভিন্ন-এক জলরেখার স্মৃতি, সমুদ্রজল, দুজনে মিলে। মেঘ করেছিল সেই দুপুরে, রোম থেকে একটু এগিয়ে ভূমধ্যসাগরের তটে যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম দুজনে, অকারণেই আঙুল তুলে পাশাপাশি এক পর্যটক বলেছিলেন হঠাৎ: ওই দূরে, সোজা ওই দক্ষিণে পাড়ি দেন যদি, তাহলেই পেয়ে যাবেন আফ্রিকা।

সরল ভূগোলের কথা সেটা। কিন্তু ভূমধ্য শব্দটা আর এই আঙুলের উত্থান তাকে করে তোলে যেন ইতিহাসেরও কথা। ফিরে আসি দুজনে, রোমের দিকে আবার, ফিরতে ফিরতে ভাবি আমাদের দুজনের এই দেখা-হয়ে-যাওয়া, কত আকস্মিক, কত অপ্রত্যাশিত, দুদিক থেকে দুজনে এসে মধ্যপথের তীব্র এই দেখা। পশ্চিম থেকে, পুব থেকে। আর এখন দুজন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখছি দক্ষিণ। দক্ষিণের ওই তৃতীয় ভুবন।

দেখা হয়েছিল এর কদিন আগে। নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে এসে পৌঁছল প্লেন, অগাধ ক্লান্তি নিয়ে এয়ারপোর্টের চেকিং পেরোতেই প্রত্যাশিত সহাস্য উৎপলকে পাওয়া গেল অপেক্ষায়, কিন্তু একটু দমিয়ে দিয়ে ঘোষণা করল সে: মিনিটপনেরো কিন্তু বসতে হবে এখানে। আমার আরেক বন্ধু আসছেন জার্মানি থেকে। একসঙ্গেই ফিরব সবাই।

বসে আছি নিরুপায়। উৎপলের জার্মান বান্ধবের খবরে উৎসাহ হয়নি একেবারেই, কেননা অনেকদিন পরে কেবলই নিজের ভাষায় শুধু ঘরোয়া কথাই বলতে ইচ্ছে করছে তখন। আবারও আন্তর্জাতিকতা?

হয়তো আধঘণ্টা পর, পিছন থেকে শুনতে পাই : 'এসে গেছেন উনি, উঠুন এবার' — আর, সন্ত্রস্ত উঠে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখি — ঈষৎ পরিহাস করেছিল উৎপল — মুখোমুখি যিনি সামনে, তিনি কোনো জার্মান নন, কলকাতারই এক বাঙালিনী তিনি।

কিছুদিনের বিচ্ছেদের পর আনন্দবেদনায় সেই দেখা হবার অনুভব, আর তারপর আমাদের এদেশওদেশ পথে পথে ঘুরে-বেড়ানোর বিহ্বলতা, আজ এই একলা বিকেলে মনে পড়ে হঠাৎ, এই কলকাতার উদ্‌ভ্রান্ত পথে। রোমের কলোসিয়াম থেকে প্যারিসের লুভর, লুভর থেকে সোরবোন। ছাত্র-উত্থান ঘটে গেছে তার কয়েক মাস আগে, পথের ওপর তার ইস্তাহার চিহ্নিত পড়ে আছে তখনো। আফ্রিকার দুর্গতদের জন্য জুরিখের পথে পথে ভিক্ষের নিশান নিয়ে ঘুরছে প্রতিবাদী ছেলেমেয়েরা। যেখানে যাই সেখানেই নতুন আবেগে কাঁপছে নতুন দিনের মানুষ।

গঙ্গা থেকে ফিরতে থাকি আবার, ফিরতে থাকি মৃত্যুচিহ্ন থেকে। সন্ধে হয়ে আসে। একটা গলির মুখে চাপা উত্তেজনা, একটু আগে কোনো সংঘর্ষ হয়ে গেছে যেন। ঘূর্ণি শুরু হয় মনে। সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে এখন। বিপন্নতা ছড়ানো চারদিকে। সবকিছু মুছে নিয়ে বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হয় কোথাও। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে মনে হয়, সে-হাতে কি অনেকদিনের অনেক ভুলের চিহ্ন লেগে নেই?

বিবেকানন্দ রোড আর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের মোড়ে খুবই ছোটো এক চায়ের দোকানে এসে বসেছি টুকরো একটা টেবিলের কাছে। অন্য টেবিল থেকে দুজন যুবা তাকিয়ে আছে ভ্রূকুটিতে। হয়তো, কেবল তাদেরই এড়াবার জন্য, পকেট থেকে কাগজ বার করি একটা, কলমও। শহরের কথা ভাবতে ভাবতে শহরের থেকে দূরে সরে যায় মন, আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় আমাদের নিভৃত ভালোবাসার সঙ্গে মিশে-যাওয়া আমাদের ইতিহাসের পৃথিবীতে। চা আনতে বলেই বিশৃঙ্খল লিখতে শুরু করি দু-একটি লাইন, তারপরই বুঝতে পারি যে আসলে কবিতাই লিখতে চাই একটা।

অল্প পরে, উঠে আসবার সময়ে দেখি, আমার পক্ষে বোধহয় বেশ বড়োই হয়ে গেল লেখাটা। যুবকদুটি তখন অবশ্য ছিল না সেখানে আর।

ভূমধ্যসাগর

আমাদের দেখা হলো আচম্বিতে
অধিকন্তু শীতে
পশ্চিমপ্রেরিত আমি, তুমি এলে পূর্বের প্রহরী
দুই প্রান্ত থেকে ফিরে আমাদের দেখা হলো ভূমধ্যসাগরে।

হাতে হাত তুলে নিই, তুমি স্রোতে কেঁপে ওঠো, বলো
'এ কী
কী সাজে সেজেছ নেশাতুর
তোমারও দুহাতে কেন কলঙ্করেখার উচ্ছলতা
দেখো কত দীন হয়ে গেছ
সমস্ত শরীর জুড়ে বিসর্পিণী অত্যাচার অপব্যয় ছন্নছাড়া ভয়
এ তো নয় যাকে আমি রচনা করেছি স্তব্ধ রাতে
কেন তুমি এলে
আমাদের দেখা হলো এ কোন্ শীতার্ত পাংশু পটে
পশ্চিমবিলাসী তুমি, আমি পূর্ব দুঃখের প্রহরী !'

ঠিক, সব জানি
আমরা অনেকদিন মুখোমুখি বসিনি সহজে।
তোমার শ্যামল মুখে আজও আছে সজীব সঞ্চার
পটভূমিকায় ওড়ে সমুদ্রের আন্তরিক হাওয়া
আমি ভ্রষ্ট উপদ্রব নিয়ে ফিরি মেরুদণ্ড ঘিরে
এমন-কী সমুদ্রে ফেলি ছিপ
কিন্তু তবু
ছেড়ে দাও হাত, শুধু দেখো এই নীলাভ তর্জনী
ভূমধ্যসাগর
পুব বা পশ্চিম নয়, দেখো ওই দক্ষিণ জগৎ
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জলে ওঠে দূর বক্ষ অন্তরাল ভেঙে।

তাই এইখানে নেমে আমাকে প্রণত হতে হয়
আমারও চোখের জলে ভরে যায় অরুণা ধরণী
দুহাতে কলঙ্ক বটে, তবু
আমারই শরীর ভেঙে জেগে ওঠে ভবিতব্য দেশ
মৃত্যুর ঝমকে আর ঝোপে ঝোপে দিব্য প্রহরণে।
কলঙ্কে রেখো না কোনো ভয়
এমন কলঙ্ক নেই যা এই দাহের চেয়ে বড়ো
এমন আগুন নেই যা আরো দেহের শুদ্ধি জানে
তুমি আমি কেউ নই, শুধু মুহূর্তের নির্বাপণ
আমাদের ফিরে যেতে হয় বারে বারে
দেশে দেশে ফিরে ফিরে ঘুরে যেতে হয়
পরস্পর অঞ্জলিতে রাখি যত উদ্যত প্রণয়
সে তো শুধু জলাঞ্জলি নয়, তারই বীজে
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জেগে ওঠে আমাদের ভেঙে
তাই এইখানে নেমে আমাদের দেখা হলো সমুদ্রের পর্যটক তটে।

ধূপের মতন দীর্ঘ উড়ে যায় মেঘাচ্ছন্ন দিন
তোমারও শরীর আজ মিলে যায় সমুদ্রের রঙে
আমাদের দেখা হয় আচম্বিতে ভূমধ্যসাগরে।
কখনো মসৃণ নয় দেখো আমাদের ভালোবাসা
তোমাকে কতটা জানি তুমি-বা আমাকে কত জানো
তাই আমাদের ভালোবাসা
প্রতিহত হতে হতে বেঁচে থাকে দিনানুদিনের দগ্ধ পাপে
আমি যদি নষ্ট হই তুমি ব্যাপ্ত করো আর্দ্র হাত
তোমার ক্ষমার সঞ্জীবতা
আমার সঞ্চার আরো দীপ্য করে দেশ দেশান্তরে
আর মধ্যজলে
চোখে চোখে জলে ওঠে ঘোর কৃষ্ণ বিস্ফারিত সসাগরা তৃতীয় ভুবন।

ফেরার সময় হলো, এসো সব সাজ খুলে ফেলি
দুই হাতে আপন্ন সংসার
নিয়ে চলো ঘরে

দিন হয়ে এল ক্ষীণ ভূমধ্যসাগরে।

৭

দিনটা ছিল বোধহয় রবিবার। পড়ন্ত দুপুরবেলায় দুনম্বর বাসের একতলায় বসে চলেছি বালিগঞ্জের দিকে। ভিড় নেই, মেজাজও সবার প্রসন্ন, দুধারের পরিচিত ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে পৌঁছে গেছি ধর্মতলা পর্যন্ত। তারপরই আসে বাধা। হঠাৎ খেয়াল হয় যে মস্ত-একটা সমাবেশ আছে আজ ময়দানে, বাস যে সোজা পথে চলতে পারবে আর, এমন কোনো ভরসা নেই। এসপ্ল্যানেডের মোড়ে এসে বোঝা যায় জট, সারি সারি আটকে আছে গাড়ি, যাত্রীদের মুখ থেকে একটু একটু করে সরে যায় প্রসাদ। কোন্ পথ দিয়ে পালিয়ে গেলে ভিড় এড়ানো যাবে, কিছু-বা গুঞ্জন ওঠে এই নিয়ে। উদ্‌ভ্রান্ত কনডাক্টরের কানে এসে পৌঁছতে থাকে কোনো কোনো পরামর্শ, এদিকওদিক দৃষ্টি মেলে দেয় সে। আর তখন, ড্রাইভার, সটান পশ্চিমমুখে চালিয়ে দেয় বাস। যাত্রীদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে গাড়ি নিয়ে সে চলে যায় একেবারে গঙ্গার ধার আর সেইখান থেকে হু হু করে দক্ষিণে। গঙ্গার বাতাস খানিকটা ধাতস্থ হয়ে আসতেই উতলা হয়ে ওঠে কোনো কোনো যাত্রী, যারা ভাবছে তাদের গম্যভূমি পেরিয়ে গেল বুঝি। ইতিমধ্যে ড্রাইভার বাঁক নিয়েছে বাঁয়ে, ঢুকে পড়েছে কিছু অজানা অলিগলির মধ্যে, আর সেইখানে, আবারও এক জট। এইবার অল্পে অল্পে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যাত্রীদের কলরোল। ড্রাইভারকে নানা-রকম নির্দেশ দিতে থাকে তারা। রাস্তার নিশানা বোঝায় নিজের নিজের জ্ঞানমতো। এমনকী স্টিয়ারিংটা কীভাবে ঘোরাতে হবে তারও নির্দেশ দেয় কেউ। হঠাৎ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তারাই ঠিক জানে, সবটাই জানে, কোন্ পথে কীভাবে এলে কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করেই পৌঁছনো যেত গন্তব্যে, সেটা নির্ভুলভাবে কেবল তাদেরই কাছে স্পষ্ট, কেবল ড্রাইভারটিই জানে না কিছু। 'এদিকটায় ঢোকালেন কেন? এখন বেরোবেন কী করে?' 'পাশের ডানদিকের রাস্তাটা ধরলেই তো ঠিক হতো!' 'কল-কাতার পথঘাট কি চেনেন কিছু? খুব তো গাড়ি চালাচ্ছেন।' 'কোথা থেকে যে জোটায় এদের!' অবিরাম এইসব বাক্যবর্ষণ কানে নিয়ে ড্রাইভার কী ভাবছে? আমি জানি না সে কী ভাবছে। কিন্তু এত স্থির, লোকের উপদেশ-নির্দেশ-তর্জনে এত সুদূর উদাসীন ড্রাইভার আমি দেখিনি প্রায় কখনো।

যাত্রীদের মধ্যে একজন বলে উঠেছিল, 'ওর কাজটা ওকেই করতে দিন না।' ফল ভালো হয়নি এই বলার, সমবেত ভৎর্সনায় নিরস্ত হয়েছে সেই স্বর। আর, অল্প পরেই, অটল এবং গম্ভীর সেই ড্রাইভার, উদাসীন এবং নিশ্চিত সেই ড্রাইভার বাসসুদ্ধ আমাদের এনে দিল একেবারে স্বস্তিজনক পরিচিত এক বড়ো রাস্তার ওপর, যাত্রীরাও মুহূর্তমধ্যে শ্বাস পালটে বলে উঠল : 'বাঃ, এই তো এসে গেছি।' 'হ্যাঁ, এবার বেশ তাড়াতাড়ি হবে।' আর এইবার, এতক্ষণের মধ্যে এই একবার মাত্র, ড্রাইভার পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখল তার যাত্রীদের, সেই একবার আমি দেখতে পেলাম তার নির্বাক মুখ, তার সবাক চোখ।

অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে আসবার পরেও হানা দিতে থাকে সেই মুখ, সেই চোখ। কী ভাবছিল সে, ফিরে তাকাবার সেই মুহূর্তে তার বিচিত্র মুখচ্ছবিতে কী কথা লুকোনো ছিল ? আর সকলেই জানে তার কাজটা, সে-ই কেবল জানে না—এতগুলি মানুষের এই উচ্চারিত গঞ্জনা কি কোনো কষ্ট দিচ্ছিল তাকে ? প্রায়ই কি তাকে সইতে হয় এ-রকম, আমাদের এই কলকাতার রাস্তায় ? কোথায় দেশ তার ? কলকাতায়, না কি বাইরের কোনো গ্রামে ?

একটা মাদুর বিছিয়ে বারান্দায় এসে শুয়েছি, মুখের ওপর অল্প একটু আলো এসে পড়ে আকাশ থেকে, হাওয়াও বইছে অল্প, মনে পড়ে আমাদের পুব-বাংলার ছোট্ট শহরের কথা, মনে হতে থাকে বড়ো এই শহরের মধ্যে আজও আমি চিনতে পারিনি কিছু। অন্য সকলেই কি সবকিছু জানে ? ফিরে আসে আবার সেই ড্রাইভারের মুখ, সেই চোখ, আর সেই সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে আসে অদ্ভুত কটা লাইন, যেন আমি বলছি কাকে : 'বাপজান হে / কইল-কাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে/আমিই কিছু জানি না।' বাপজান কেন হঠাৎ ? অল্প একটু হাসি এসে পৌঁছয় ঠোঁটের কোণে। একটু অপেক্ষা করে থাকি, মনের মধ্যে কেবলই ঘুরতে থাকে শব্দকটা। আর, কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হয়ে আসে ছোটো এক কবিতা, দিনের বেলার ওই ঘটনার সঙ্গে সামান্যই তার যোগ।

কলকাতা

বাপজান হে
কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সকলেই সব জানে
আমিই কিছু জানি না

আমারে কেউ পুছত না
কইলকাত্তার পথে ঘাটে অন্য সবাই দুষ্ট বটে
নিজে তো কেউ দুষ্ট না

কইলকাত্তার লাশে
যার দিকে চাই তারই মুখে আদ্দিকালের মজা পুকুর
শ্যাওলাপচা ভাসে

অ সোনাবৌ আমিনা
আমারে তুই বাইন্দা রাখিস, জীবন ভইরা আমি তো আর
কইলকাত্তায় যামু না

৮

অনিশ্চয়ে, অস্থিরতায় কাঁপছে দিনগুলি। মৃত্যুর খবর ছাড়া কোনো খবর শোনা যায় না কোথাও। কখনোকখনো চোখের সামনে দেখতে হয় সংঘর্ষের ছবি, যে-সংঘর্ষের দুদিকেই চেনামুখের ভিড়। কখনো দেখতে হয়, যাদবপুর যাবার পথে, ঢাকুরিয়া থেকে বেঙ্গল ল্যাম্প পর্যন্ত সবকটা স্টপেই বাসে উঠে সশস্ত্র যুবকেরা তাদের শত্রু খুঁজে বেড়ায়। যাকে খুঁজছে, এই কদিন আগেও সে হয়তো তাদেরই কোনো নিকটবন্ধু ছিল।

সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, খুঁজে দেখে কে কার গুপ্তচর। সেই সন্দেহে, দেখেছি পাঁচিলের সঙ্গে রণজয়কে কীভাবে পিষে ধরেছিল ছেলের দল আমাদের সকলেরই চোখের সামনে; দেখেছি শিপ্রাকে কীভাবে কব্জি ধরে ঝোপের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল এ-প্রতিষ্ঠানেরই বলশালী এক সহ-কর্মী; কলেজপ্রাঙ্গণে কোনো একটি চেক ফিল্ম দেখাবার সমর্থন জানিয়েছিল বলে অশ্লীলতার অপরাধে অলোকরঞ্জনকে কটুতম উচ্চারণে কীভাবে ঘিরে নিয়ে গিয়েছিল উপাচার্যের দরবারে, জেনেছি তাও।

বহুপক্ষ হয়ে গেছে আজ। সকলেই বলে মার্ক্সবাদের কথা, কিন্তু পরস্পরের প্রতি আজ প্রখর তাদের ঘৃণা। কোথায় নিয়ে চলেছে এই ঘৃণা? সেকথা ভাববার কোনো সময় নেই মনে হয়। আজও বুঝি তেমনি কোনো রক্তক্ষরণ হতে চলেছে, এই মুহূর্তেই। বাস থেকে যে-মুখটিকে ওই নামিয়ে নিল এইমাত্র, আর হিংস্র আক্রোশে ঘিরে ধরল ওই যারা, লাঠি দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল আমাদের—তারা সকলেই তো আমাদের চেনা, আমাদেরই কারো-না-কারো ছাত্র। অন্য-এক বাস থেকে নামতেই আমাদের মাস্টারমশাই, দেবীপদ ভট্টাচার্য, পড়ে গেলেন একেবারে সেই আবর্তের মাঝখানে। আর, অন্য কিছু বুঝে উঠবার আগেই, আতঙ্কছিন্ন সেই ছেলেটিকে আগলে নিলেন নিজের বুকে। ধ্বস্তাধ্বস্তি অবশ্য চলতে থাকল আরো কিছুক্ষণ। কিন্তু রক্তপাতটাকে আপাতত রোধ করা গেল বোধহয়।

ক্লাসের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে আজ। অনেক গ্লানির মধ্যে একটা পুণ্য-দৃশ্যের সঞ্চয় হয়েছে চোখে। বন্ধুরা কাছাকাছি নেই কেউ। গরম দুপুর। ফিরে

চলেছি বাড়ির দিকে। কাজ নেই এখন। তবে কি বাবা-মা'র সঙ্গে একবার দেখা করে যাব ? শেয়ালদায় নেমে বাঁক নিয়ে চলে যাই কাইজার ষ্ট্রিট। বাবা একটা বই পড়ছেন। ঘুমোচ্ছেন বৌদি। সেলাই করতে করতে মা বলছেন : 'কলেজ থেকে ?' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে আমিও একখানা বই নিয়ে এলিয়ে পড়ি খাটের ওপর। মন লাগে না ঠিক, ঘিরে থাকে দুপুরের ছবিগুলি। একটু পরে, জড়িয়ে আসে চোখ।

চায়ের জন্য মা যখন ডাকছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। উঠেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি আবার। 'ফিরছিস এখনই ?' কিন্তু এ-প্রশ্নের প্রায়-কোনো উত্তর না দিয়েই নেমে আসি সিঁড়ি বেয়ে। পথে নেমেছি যখন, বিকেলের শেষ সূর্য আকাশে লেগে আছে তখনো। ওই সূর্যটাকে তো দেখিনি স্বপ্নে ? কোন্ অবাস্তব সূর্য দেখলাম তবে ? অবসাদ আরো গাঢ় হয়ে বসে। মনে হলো, এখনই ফিরে যেতে হবে। লিখে ফেলতে হবে গোটা স্বপ্নটাই, ঠিক যেভাবে দেখেছি।

বিকেলবেলা

সারাদিনের পর অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি আজ বিকেলবেলা
আর স্বপ্ন দেখছি যে-স্বপ্ন দেখার কোনো কথা ছিল না আমার
যে, একটা নয় দুটো নয় তিন-তিনটে রুপোলি গোলক ঝকঝক করছে
ঢালু আকাশে
তার নিশ্বাস যতদূর পৌঁছয় ততদূর টলে পড়ছে মানুষ।

সবার মুখ তাই থমথমে আমি জিজ্ঞেস করি ওখানে কী, কী হয়েছে ওখানে
শুনে একজন বলে ও কিছু নয়, মা বলল জলের রঙে আগুন
অনেকদিন আগে এ-রকমই হয়েছিল একবার, ঘরদুয়োর সব বন্ধ করে দাও
সেবার আর বাঁচেনি কেউ মড়কে ছেয়ে গিয়েছিল দেশ।

রুপোলি আলো পারদের মতো ঘন হয়ে এগিয়ে আসে আমার মুখের ওপর
যেন জল থেকে গাঢ়তর জলে ডুবে যায় সমস্ত শরীর
কাগজে তৈরি আমার ভাইয়ের মুখ ঝুলে পড়ে কার্নিশ থেকে বাইরের হাওয়ায়
আর দেখতে দেখতে অবেলার ঘুম ভেঙে যায়, দুচোখ ভার।

৯

মনে পড়ে তিমিরের কথা, তিমিরবরণ সিংহ।

অনার্স ক্লাসে এসে ভর্তি হলো যখন, তরুণ লাবণ্যময় মুখ, উজ্জ্বল চোখ, নম্র আর লাজুক। অজিত দত্ত একদিন বকেছিলেন বলে সেই অভিমানে ছেড়ে দেবে কলেজ, জলভরা চোখে বলেছিল একদিন, অনেকরকম সান্ত্বনায় তার মন ভোলাতে হয়েছিল তখন। তারপর, প্রায় একবছর বিদেশে কাটাবার পর যখন ফিরে এসেছি আবার আটষট্টিতে, তিমিরের মুখের রেখায় অনেক বদল হয়ে গেছে ততদিনে। কেবল তিমিরের নয়, অনেক যুবকেরই তখন পালটে গেছে আদল, অনেকেরই তখন মনে হচ্ছে নকশালবাড়ির পথ দেশের মুক্তির পথ, সে-পথে মেতে উঠেছে অনেকের মতো তিমিরও। দু-একটি গল্প-কবিতা লিখছে সে, কলেজ আর কলেজের বাইরে সাহিত্যপত্র আর সাহিত্যসভার আয়োজন করছে কখনো, ক্লাসে মাঝেমাঝে সাহিত্যতাত্ত্বিক যেসব প্রশ্ন বা তর্ক তুলছে তার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওর রাজনৈতিক ভাবনার দৃঢ়তা, আমেরিকায় গিয়েছিলাম বলে আমার সঙ্গে তৈরি হয়েছে একটা কৌণিক দূরত্ব। আর্ট্স-বাড়ি থেকে লাইব্রেরির দিকে যাবার পথে দেখতে পাই মাঠের মধ্যে বসে দুচারজন সমবয়সীর সঙ্গে কথা বলছে সে, ইচ্ছে করেই আমাকে লক্ষ করতে চায় না, কিন্তু চোখমুখ থেকে বুঝতে পারি নিছক আড্ডা নয় ওই বৈঠক, গূঢ়-তর ভাবনা আর স্বপ্নের একটা আলো ছড়িয়ে আছে মুখে।

ওদের বি. এ. পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল, এর কিছুদিন পর। কলেজের ঘরে বসে আছি, হঠাৎ এসে ঢুকল তিমির। একটি কাগজ হাতে তুলে দিয়ে জানতে চাইল : 'এ বইগুলির কোনোটা কি আছে আপনার কাছে ?' কাগজটাতে ছিল লম্বা এক নামের ফর্দ, নানারকম বইয়ের নাম, ইংরেজিতে বা বাংলায়, সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের রাজনীতির অর্থনীতির বই। নামগুলির নির্বাচন তাৎপর্যহীন নয়, বুঝতে পারি তার অভিপ্রায়। কোনো-কোনোটি যে আছে, জানালাম তাকে। দিতে পারি কি ? হ্যাঁ, তাও পারি। 'ফেরত পেতে কিন্তু দেরি হবে অনেক। এখন তো দেখা হবে না অনেকদিন।' 'অনেকদিন আর কোথায় ? তোমাদের এম্. এ. ক্লাস শুরু হতে খুব তো বেশি দেরি নেই আর।' অল্প খানিকক্ষণ নিচু-মুখে বসে রইল তিমির, বলল তারপর : 'কিন্তু এম্. এ. পড়ছি না আমি। পড়ে

কোনো লাভ নেই। কোনো মানে নেই এইসব পড়াশোনার। আপনি কি মনে করেন, না-পড়লে কোনো ক্ষতি আছে?' 'যোগ্যতর যদি করতে পারো কিছু, তাহলে নিশ্চয়ই ক্ষতি নেই। কিছু কি করবে ভাবছ?' 'আপনি তো জানেন আমি রাজনীতি করি।' 'হ্যাঁ, কিন্তু তার জন্যে তো পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া অনিবার্য নয়।' আবার একটু সময় চুপ থাকার পর জানাল তিমির : 'গ্রামে চলে যাচ্ছি আমি। কোথায় থাকব, কবে ফিরব, কিছুই ঠিক নেই। বইগুলি সঙ্গে থাকলে একটু সুবিধে হবে আমার।'

তারপর একদিন গ্রামে চলে গেছে সে। এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রাম, কোথায় কখন তার কোনো খবর জানিনি আমরা। বিশেষ থেকে নির্বিশেষ হয়ে গেছে একদিন, আরো অনেক চেনাঅচেনা ছেলের মতো। মাঝেমাঝে উড়ো খবর শুনতে পাই ; শুনতে পাই সংগঠনে সে খুব জোরালো আর জনপ্রিয়, আর পুলিশও তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে চারদিকে। শুনতে পাই, নানা ছদ্মসাজে পুলিশের চোখ এড়িয়ে কাজ করে চলেছে সে। কিন্তু ধরাও পড়ে একদিন। আর তারপর, আবার একদিন, ষোলোজন সহবন্দীর সঙ্গে মিলিয়ে তাকে পিটিয়ে মারে পুলিশ—সে-খবরও কানে এসে পৌঁছয়।

নির্বিশেষ আবার বিশেষ হয়ে ওঠে। একা তিমিরই তো নয়, কয়েক বছরের মধ্যে কতই-তো এমন অবিশ্বাস্য নৃশংসতা ঘটে গেল আমাদের অন্ধ ইতিহাসে, আরো কত এমন কিশোরযুবার কাহিনী চাপা পড়ে রইল সময়ের ডানায়। কিন্তু তবু, যাদের এত কাছে থেকে জেনেছিলাম, যাদের স্বপ্নের ছোঁয়া লেগে আমাদেরও মধ্যে কখনো কখনো জীবনের সঞ্চার হতো, সেইসব মানুষের এই পরিণাম নতুনভাবে একবার বিপর্যস্ত করে যায় মন।

তারপর কেটে গেছে অনেকদিন। ক্লাস শেষ করে ন-নম্বর বাসের দোতলায় বসে পাড়ি দিচ্ছি যাদবপুর থেকে শ্যামবাজার। কুয়াশাভরা সন্ধ্যায় ময়দানের কাছে গাড়ি বাঁক নিতেই দ্রুত ফুটে উঠল কয়েকটা ছবি। এই সেই ময়দান, যেখানে ভোররাতে পুলিশের হাতে কত হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে অনায়াসে, পড়ে থেকেছে কত রক্তাক্ত শরীর। মনে পড়ল তিমিরকে। মনে পড়ল তাঁর মাকে, যাঁকে আমি দেখিইনি কখনো আর, মনে এল কয়েকটা লাইন, পর পর ছোটো দুটি লেখা।

তিমির বিষয়ে দু-টুকরো

আন্দোলন

ময়দান ভারি হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ
তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া ?
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।

নিহত ছেলের মা

আকাশ ভরে যায় ভস্মে
দেবতাদের অভিমান এইরকম
আর আমাদের বুক থেকে চরাচরব্যাপী কালো হাওয়ার উত্থান
এ ছাড়া
আর কোনো শাস্তি নেই কোনো অশান্তিও না।

১০

সাঙ্গ হয়ে গেছে বাহাত্তরের নির্বাচন। যে আন্দোলন শুরু করেছিল তিমিরেরা, তার কর্মীদের কেউ মৃত, কেউ বন্দী, কেউ-বা প্রচ্ছন্ন।

বৃষ্টি হচ্ছে সেদিন, সন্ধেবেলায় আটকে আছি বাড়িতে, বারান্দায় ইজি-চেয়ারের ক্ষমাহীন আলস্যে বসে আছি। বৃষ্টি একটু থামে, কিন্তু মেঘ জমে আছে তখনো। শৃঙ্খলাহীন এলোমেলো ভাবনা চলছে মনে। জানালার রেলিং-এর মধ্য দিয়ে—যেন গারদের মধ্য দিয়ে—তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে। হঠাৎ বুঝি বাজ পড়ল কোথাও, বিদ্যুৎরেখায় খানখান হয়ে গেল মেঘ। একলহমায় সেই দৃশ্য আবার তুলে আনল তিমিরের ছবি।

পুলিশের হাতে খুন হবার পর তাকে একবার আনা হয়েছিল কলকাতায়, শুনেছি। দেখিনি সেই মুখ। কিন্তু সে-মুখেরও কি আদল হয়েছিল ওইরকম, ওই বিদ্যুতে-ভাঙা মেঘ?

ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ

ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ

চুরমার ফেটে যায় মেঘ, দশভাগে দশটান বিদ্যুৎ
তারপর সব চুপ

এই তোমার মুখ, তিমির
কিন্তু তারপর সব চুপ

পাথর কুলিশ লোহা শাবল হাণ্টার
তারপর সব চুপ

ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ

ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ

১১

নারকেলডাঙায়, রেললাইনের এপারে মাসীমার বাড়িতে বসে শুনছি হৈ হৈ শব্দ, দেখছি ওপারের বসতিগুলির মাথায় মাথায় ঝাঁপিয়ে আসছে কয়েকটি ছেলে আর জয়োল্লাসে এখানে-ওখানে গেঁথে দিচ্ছে কংগ্রেসের নিশান। অনেকদিন এদের দখল ছিল না এখানে, কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টও ভেঙে গেছে, নতুন করে এরা জায়গা নিচ্ছে আবার। ছুটির দিন, সবাই আছে ঘরে, আছে রঞ্জনও। এপাড়ার সিপিএম কর্মীদের প্রধান একজন সে, মাসীমার এই ছেলে। সকলেই কিছু-না-কিছু বলছি, স্তব্ধ শুধু রঞ্জন। একটা অস্পষ্ট ছায়া সবারই মুখের স্বাভাবিকতা সরিয়ে নিয়েছে। কেবল, যেন কিছুই হয়নি, এমন স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বলে চলেছেন মাসীমা। 'কদ্দূর আর আসবে। ওই পর্যন্তই! এদিকে আর ঢুকতে পারবে না।'

কেবল এই একটা অঞ্চলেই নয়। গোটা শহর জুড়ে এ-রকমই ছড়িয়ে পড়তে লাগল তারপর, কিছুদিন ধরে। নির্বাচন-প্রহসনের পর পাড়ায়-পাড়ায় বিন্যাসটা গেল একেবারেই পালটে, সিপিএম ক্যাডারদের অনেককেই তখন ঘর ছেড়ে চলে যেতে হলো ভিন্ন কোনো পাড়ায় কিংবা গোপন কোনো আস্তানায়। যেতে হলো রঞ্জনকেও। মনের মধ্যে যাই হোক, মাসীমার মুখশ্রীর স্বাভাবিকতায় তখনো কোনো ভাঙন দেখিনি আমরা। পার্টির নামোচ্চারণে তখনো তাঁর মুখ সহজে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তারপর, বাহাত্তর সালের শেষদিক তখন, ধরা পড়ল তাঁর অমোচনীয় ক্যান্সার। যেমন হয়, ধরা পড়ল খুবই দেরিতে। পার্ক সার্কাসের হাসপাতালে অপারেশন হলো যখন, ডাক্তার বুঝিয়ে দিলেন ভরসা বেশি নেই।

এবেলা ওবেলা সবাই দেখতে যাই তাঁকে। নির্ভয়ে আসতে পারে না শুধু রঞ্জন। সে একটা সময়, যখন অনেক রঞ্জনই পৌঁছতে পারে না এমন অনেক মায়ের কাছে। এ কোনো অচেনা ঘটনা নয়। এমনি সময়ে একদিন গিয়ে শুনি, জ্ঞান হয়েছে অল্প, কিন্তু ঘুমোতে পারেননি কাল সারারাত, চমকে চমকে উঠেছেন, বলেছেন দু-একটি অস্ফুট কথা, যেন ভয় পাচ্ছেন যে ছেলেকে মারতে আসছে কেউ। ঘুমোতে পারছেন না কেন? কেননা দেওয়ালির উৎসব ছিল কাল, হাসপাতালের চত্বর তাই সারারাত ভরপুর ছিল পুজোয়, বাজিবাজনায়

বিপুল আয়োজনে। হাসপাতালের মধ্যে ? হ্যাঁ, হাসপাতালের মধ্যেই। কে দেবে বাধা ? কার এত সাহস ?

মৃত্যুর আর বেশি দেরি হয়নি অবশ্য। রুমালে বাঁধা সামান্য কয়েকটি টাকা ছিল তাঁর। বলেছিলেন অর্ধেকটা ছেলের হাতে দিতে, আর অর্ধেকটা পার্টিফাণ্ডে।

বোধহয় এর বছর দেড়েক পর, অন্য এক হাসপাতালে ঢুকবার পথে উৎকট হুল্লোড় দেখে থমকে দাঁড়িয়েছি যখন, চোখের সামনে ফিরে এল সেই রাত, বাজিবাজনায় উতরোল, আর মনে হলো হঠাৎ : বাধা দেবার ছিল না কেউ, আমার ভাই ছিল ফেরার, আমার ভাই ছিল ফেরার !

হাসপাতালে বলির বাজনা

আমার ভাই ছিল ফেরার, আমার মাসীমা যখন মারা যান।

চারদিকে ছুটছিল বাজি, কালীপুজোর রাত। হাসপাতালের বারান্দাও কেঁপে উঠছিল আনন্দে।

তালে তালে জাগছিল হিক্কা, শেষ সময়ের নিশ্বাস। হয়তো এবার শুনতে পাব : রঞ্জন রঞ্জন

বেজে উঠল ঢাক, হাজার কাঠির ঝনৎকার। আমরা সবাই নিচু হয়ে কান নিয়েছি কাছে

ঠোঁটের ভিতর ফেনিল ঢেউ : এল ওই এল ওদের নিশান, আমায় ছাড়্। তুবড়ি ওঠে জ্ব'লে।

আমরা সবাই বলেছিলাম : শেষ সময়ের প্রলাপ।

হাসপাতালে বলির বাজনা। ভাই ছিল ফেরার।

১২

বিবেকানন্দ রোড আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর মোড়টা পেরিয়ে এসেছে উত্তর-মুখী বাস, দোতলার জানলার ধারে প্রায় সামনের দিকে বসে আছি, উঠে এল ন-দশ বছরের একটি ছেলে। কাঁধ থেকে ঝুলে পড়েছে ছেঁড়া একফালি জামা, ছোট্ট একটা মাটির হাঁড়ি হাতে। সমস্ত সীট টপ্‌কে একেবারে সামনে এসে বসে পড়ল নিচে, সবার মুখোমুখি। হাঁড়িটা উলটে নিয়ে টপাটপ বাজাতে বাজাতে তার চিকন গলায় শুরু করল গান।

অফিসফিরতি ধ্বস্ত যাত্রীরা চনমন করে উঠলেন সবাই। ভারি সুরেলা গলা তো! বাঃ, ভারি স্বচ্ছন্দ গান! গাওয়া শেষ হতে হতে আগ্রহে ঝুঁকে পড়েছেন অনেকে, বলছেন: 'চমৎকার! শিখলি কোথায় রে! গা, আরেক-খানা গা।' ছেলেটির খিন্ন মুখে যেন আলো পড়ে একটু, গায় সে আবার। এবারও শেষ হয়ে এলে, আসে আরেকবারের নির্দেশ। যেন কোনো গানের আসরেই বসে আছি আমরা, প্রিয় কোনো শিল্পীকে যেন একটির পর একটি অনুনয় ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, একোণ থেকে ওকোণ থেকে। ছেলেটির ঠোঁটে স্নিগ্ধ একটুকরো হাসিই লেগে রইল এবার। গাইল সে আবার।

গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন দু-চারজন, তাঁদের ছেড়ে-যাওয়া আসন ভরে দিচ্ছেন অপেক্ষমাণ পিছনের যাত্রীরা। ছেলেটিরও গান শেষ হলো, উঠেছে সে। একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে হাত বাড়িয়ে এক-পা এক-পা এগিয়ে চলেছে, সে তার পারিশ্রমিক চায় এবার।

আর তখনই ঘটতে থাকে সেই কাণ্ডটা! তারিফ করছিলেন যাঁরা, তাঁরা কেউ কেউ তখন জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরে। পথের আর ভিতরের বহু ধ্বনিপ্রতিধ্বনির মধ্য দিয়ে যাকে সুর পৌঁছে দিতে হচ্ছিল তিন-তিনবার, বহু স্টপ গড়িয়ে এসেছে যে, সে বান্দা অবশ্য নাছোড়। হাত বাড়িয়ে পাশে দাঁড়িয়ে কেবলই বলতে থাকে: বাবু, বাবু—

আর শুনতে থাকে

'বলবেন না আর, ভিখিরিতে ভরে গেল দেশটা। সর্ সর্, গায়ের উপর পড়বি না কি?' 'ভিখিরি কী বলছেন! এদের তলে তলে সব বজ্জাতি। কিচ্ছু করবে না, করতে চায় না, ভিখিরি সেজে পয়সার ধান্দা!' 'কী রে ছোকরা,

ভিক্ষে করিস কেন? খেটে খেতে পারিস না? কাজ দিলে করবি? ঘরের কাজ করবি?' 'দেখুন, কেমন মট্‌কা মেরে আছে।' 'ঘরের কাজ করবে কী! ওসব বলবেন না। বেশির ভাগই এরা চোর-বাটপাড়, ভুলেও যেন ঘরে ঢোকাবেন না।'

বাস চলবার তালে তালে দুলতে থাকে কথাগুলি। ছেলেটি একটু একটু করে এগোয়। একবার ডাইনে তাকায়, একবার বাঁয়ে তাকায়। চোখদুটো পালটে যেতে থাকে। গুটিয়ে নেয় হাত। সিঁড়িতে পা দেবার মুখে পিছন ফিরে একবার আলতো স্বরে বলে শুধু: আর গান করব না। সকলের মুখ দেখে নিয়ে নেমে যায় নিচে।

শুধু রেখে যায় তার দৃষ্টি। আমার সঙ্গে কদিন ধরে কেবলই ঘুরতে থাকে সেই দৃষ্টি, আর তার সেই অভিমান, 'আর গান করব না' বলে তার সেই অসহায় প্রতিবাদের নেমে যাওয়া।

ভিখিরি ছেলের অভিমান

আগে বলবেন, গা রে খোকা
পরে বলবেন, মাপ করো —
সামনে থেকে যা সরে যা
চলার পথটা সাফ করো

গাব না তাই গান

আগে বলবেন, গতর খাটো
পরে মারবেন লাথি
আগে কথার ধুল্ ওড়াবেন
পরে দাঁতকপাটি

গাব না আর গান

বেশ করেছি ভেক ধরেছি
বাঁচিয়ে রাখি জান
দূরের থেকে দেখি সবার
দরদভরা টান

গাব না আর গান এবার
গাব না আর গান।

১৩

শেষ হয়ে আসছে ১৯৭৪।

বড়ো মেয়েটি বেশ অসুস্থ তখন, ডাক্তারেরা ভালো ধরতে পারছেন না রোগটা ঠিক কোথায়। শুয়ে আছে অনেকদিন, মুখের লাবণ্য যাচ্ছে মিলিয়ে। অথচ তখন তার ফুটে উঠবার বয়স।

মন্থর হয়ে আছে মনটা।

ঘুরে বেড়াচ্ছি একদিন যাদবপুরের ক্যাম্পাসের মধ্যে, দিনের ক্লাস আর সন্ধ্যার ক্লাসের সন্ধিমুখে মাঝখানে অনিশ্চিত ফাঁকা বিকেল, বন্ধুরা কেউ সঙ্গে নেই সেদিন। পশ্চিম থেকে পুবে, রাস্তার ওপর পায়চারি করতে করতে ঘরের ছবির সঙ্গে মনে ভিড় করে আসে ক্যাম্পাসেরও পুরোনো অনেক ছবি। দু-একটি ছেলেমেয়ে কখনোকখনো পাশ দিয়ে চলে যায়, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়: কদিন আগেও এখানে যত প্রখরতা ঝলসে উঠত নানা সময়ে, তা যেন একটু স্তম্ভিত হয়ে আছে আজ। কেবল যে এখানেই তা তো নয়, গোটা দেশ জুড়েই। সে কি খুব শান্তির সময় ছিল? একেবারেই নয়। সংঘর্ষ অশান্তিতেই বরং ভরে ছিল দিনগুলি। এই পথ ওই মাঠ, এর প্রতিটি বিন্দু তার কোনো-না-কোনো উন্মাদনার চিহ্ন ধরে আছে, ভুলের লাঞ্ছনার আত্মক্ষয়ের, কিন্তু সেইসঙ্গে কিছু স্বপ্নেরও, কিছু জীবনেরও। আজ প্রশমিত হয়ে আছে সব। কিছু-একটা হবার কথা ছিল, অলক্ষ্য কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু হলো না ঠিক, হয়ে উঠল না।

কিন্তু কেন হলো না? আমরাই কি দায়ী নই? কিছু কি করেছি আমরা? করতে পেরেছি? আমাদের অল্পবয়স থেকে সমস্তটা সময় স্তূপ হয়ে ঘিরে ধরতে থাকে মাথা। ফিরে আসে মেয়ের মুখ। মনে পড়ে আমার নিষ্ক্রিয়তার কথা। তাকিয়ে দেখি কলেজপ্রাঙ্গণ, ফাঁকা। হাঁটতে হাঁটতে পুবের শেষ প্রান্তে গিয়ে পশ্চিমমুখে ফিরেছি আবার, চোখ পড়ে আকাশে। সূর্য আড়াল হয়ে যাবে আর অল্প পরেই। হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ তখন মনে হলো মাটির ওপর জানু পেতে বসে পড়ি একবার এই সূর্যের সামনে, কেউ তো নেই কোথাও! যেন সমস্ত শরীর ভরে উদ্‌গত হয়ে উঠতে চায় অতল থেকে কোনো প্রার্থনা, সকলের জন্য। মনে এল নামাজের ছবি। আর সঙ্গেসঙ্গে মনে এল

ইতিহাসের পুরোনো সেই গল্প, রুগ্ণ হুমায়ুনকে ঘিরে ঘিরে বাবরের প্রার্থনা। মন্থরতার ভিতর থেকে তখন উঠে আসতে চায় কতগুলি শব্দ : এই তো জানু পেতে—,এই তো জানু পেতে—

পথ ছেড়ে দ্রুত পায়ে উঠে আসি সিঁড়ি বেয়ে, তিনতলার ঘরে। দিন আর রাত্রির মাঝখানে অল্পসময়ের জন্য পরিত্যক্ত করিডর, তার শেষ প্রান্তে আচ্ছন্ন একলা ঘর। টেবিলের সামনে এসে বসি। মনে হয় একটা লেখা হবে।

বাবরের প্রার্থনা

এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত—
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়!
চোখের কোণে এই সমূহ পরাভব
বিষায় ফুসফুস ধমনী শিরা!

জাগাও শহরের প্রান্তে প্রান্তরে
ধূসর শূন্যের আজান গান;
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?

না কি এ প্রাসাদের আলোর ঝলসানি
পুড়িয়ে দেয় সব হৃদয় হাড়
এবং শরীরের ভিতরে বাসা গড়ে
লক্ষ নির্বোধ পতঙ্গের?

আমারই হাতে এত দিয়েছ সম্ভার
জীর্ণ করে ওকে কোথায় নেবে?
ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

৫

১৪

২৬ জুন ১৯৭৫। জারি হলো জরুরি অবস্থা। প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেছেন : দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন।

চাপা ক্ষোভ চারদিকে। অবশ্য, সকলেরই নয়। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে চান এটা ভালোরই জন্য। আরো বড়ো বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচাবার এই শেষ নিরুপায় পথ, বলছেন তাঁরা। তর্ক হয়, মীমাংসাহীন তর্ক। ঘোষণা শুনতে পাই : বিনা সেন্সরে কিছুই ছাপা যাবে না আর। ঘোষণা শুনতে পাই : যে-কোনো প্রতিবাদের জন্য গ্রেপ্তার করতে পারে পুলিশ। মনে পড়ে প্রায় পঁচাত্তর বছরের পুরোনো রবীন্দ্রনাথের 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ, মনে পড়ে স্বাভিমানমত্ত দুর্যোধনের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের সতর্কবাণী, যার উত্তরে বলেছিল স্পর্ধিত দুর্যোধন : 'নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরুদ্ধ করি'। আজও সেই কণ্ঠরোধ? সন্ত্রস্ত চিত্ত টিভিতে, রেডিয়োতে বা কাগজের অফিসে, কর্মীরা যেন অতিসতর্ক হয়ে উঠেছেন তখন, নিজেরা কেউ আর কোনো ঝুঁকি নিতে চান না, যে-কোনো শব্দে সিডিশনের দূরতম আভাস পেলেই—এমনকী না-পেলেও কখনো-বা—সেন্সর করতে থাকেন সেই লেখা। 'ইন্দ্রের ভয়ে ব্রহ্মা তখন ঘরে কুলুপ দিয়েছে'—অবনীন্দ্রনাথের পরিহাসময় যাত্রাপালার এই সংলাপকে টিভি-কর্তৃপক্ষ ছেঁটে দিতে চান তখন, কেননা কেউ তো ভাবতেও পারে 'ইন্দ্র' কথাটা এখানে 'ইন্দিরা'রই কোনো ছদ্মশব্দ মাত্র! জেলের বাইরে সমস্ত দেশটাই জেলখানা হয়ে আছে, রবীন্দ্রনাথের গল্পের এ-উচ্চারণ তো আকাশবাণীর কাছে তখন বজ্রাঘাত হয়েই আসতে পারে। নিষিদ্ধ হতে শুরু করেছে তখন রবীন্দ্রনাথের পরিচিত কবিতা বা গান। কিন্তু কে করছে নিষেধ? আমরাই, আমাদেরই মতো কেউ-না-কেউ। পুলিশি আক্রমণের চেয়েও তখন লজ্জার আর ভয়ের মনে হলো মানুষের এই অতল ত্রাস, সশব্দে তার এই মেরুদণ্ড ভেঙেযাওয়া।

অপমান বোধ হয়। অপমান বোধ হয়, ভয় দেখিয়ে শাসন করবার এই লজ্জাহীন ফ্যাসিস্ট আয়োজন দেখে। স্ট্র্যাটেজি হিসেবে অনেকে চুপ থাকতে চান সত্যি, কিন্তু প্রতিবাদে এগিয়ে এসে পুলিশের কাছে তাড়িতও হন অনেকে গোটা দেশ জুড়ে। যে-কোনো রকম ঝুঁকি নিয়ে কথা বলেন তাঁরা। দিল্লির মসনদ কি জানে না যে প্রতিবাদীর এই সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলবে?

অনিচ্ছুকের ওপর চাপ দিয়ে খুব বেশিদিন যে বাঁচে না ক্ষমতা, ইতিহাস কি তাকে শেখায় নি এটা ?

নিছক আড্ডা চলছিল এক সকালবেলায় সন্দীপনের ঘরে। নানাকথার মধ্যে কেউ একজন বললেন তাঁর পরিচিত কোনো বাগানবিলাসীর খেয়ালের গল্প। একটা চারাগাছ লাগিয়েছেন তিনি টবে, বড়ো হলে প্রকাণ্ড হবে সেই গাছ। প্রকাণ্ড গাছ, ছোটো একটা টবে ? টবটা বাঁচবে তো ? এ-সংশয়ে অবশ্য কান দেননি সেই বিলাসী, তিনি বিশ্বাস করেন পরীক্ষায়। তারপর ? 'তার-পর আর কী। তারপর একদিন ফেটে গেল সেই টব।'

কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে বাসে উঠি। কিন্তু নেমে আসি এক স্টপ পরেই। হাঁটতে থাকি একলা বি. টি. রোড ধরে। ঠিক, ফেটে যাবে টব। বেড়েই চলবে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদীর সংখ্যা। মনটা হালকা লাগে বেশ। পদ-ক্ষেপে পদক্ষেপে পেতে থাকি কয়েকটা লাইন।

রাধাচূড়া

মালী বলেছিল। সেইমতো
টবে লাগিয়েছি রাধাচূড়া।
এতটুকু টবে এতটা গাছ?
সে কি হতে পারে? মালী বলে
হতে পারে যদি ঠিক জানো
কী ভাবে বানায় গাছপালা।

খুব যদি বাড়্ বেড়ে ওঠে
দাও ছেঁটে দাও সব মাথা
কিছুতে কোরো না সীমাছাড়া
থেকে যাবে ঠিক ঠাণ্ডা চুপ—
ঘরেরও দিব্যি শোভা হবে
লোকেও বলবে রাধাচূড়া।

সবই বলেছিল ঠিক, শুধু
মালী যা বলেনি সেটা হলো
সেই বাড়্ নিচে চারিয়ে যায়
শিকড়ে শিকড়ে মাথা খোঁড়ে, আর
এখানে-ওখানে মাটি ফুঁড়ে
হয়ে ওঠে এক অন্য গাছ।

এমনকী সেই মরশুমি টব
ইতস্ততের চোরা টানে
বড়ো মাথা ছেড়ে ছোটো মাথায়
কাতারে কাতারে ঝেঁপে আসায়
ফেটে যেতে পারে হঠাৎ যে
সেকথা কি মালী বলেছিল?

মালী তা বলেনি, রাধাচূড়া!

১৫

সবই কেমন ঠিকমতো চলছে এখন, লক্ষ করছেন? এদেশে রেলগাড়ি যে এত সময়মতো চলে, জানতেন কখনো? ঘড়ি ধরে, কাঁটায় কাঁটায়,প্লাটফর্মে ঢুকছে গাড়ি, বেরোচ্ছে প্লাটফর্ম ছেড়ে। অফিসে যান; যে-কোনো অফিসে, দেখবেন সব সময়মতো হাজির। দেখেছেন কখনো আগে? সে-দেশের না! কিছুটা ডিক্টেটরশিপ না থাকলে কিছু হবার নয় এই দেশের। এমন শৃঙ্খলায় যদি চলে সব, তাহলে কী এসে যায় বাক্‌স্বাধীনতাকে দুদণ্ড থামিয়ে রাখলে? কজন সাংবাদিক নিছক বিষোদ্গার করতে পারল না বলে, কজন লেখক তাদের খুদে অহমিকা প্রকাশ করতে পারল না বলে কী এসে যায় গোটা দেশের?

ঠিক, সবই ঠিকমতো চলছে। মাইল মাইল আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে। মনে পড়ে জীবনানন্দের লাইন। মনে পড়ে এর টুকরো ব্যবহারে দেবেশের ছোটো উপন্যাসটি। সরকার-ঘোষিত গণকবরের অশনাক্ত এগারোটি মৃতদেহের মধ্যে যেখানে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছিল ইউনিয়নের এক নিহত কর্মীকে, মনে পড়ে সেই কালচিহ্নিত গল্প!

ঠিক, মাইল মাইল শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে।

শমী এসে বলে একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে হামলার বিবরণ। চেন রড ছুরি নিয়েএকদল ছেলে তাদের চোখের সামনে কীভাবে নৃশংস ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, টেনে বার করে নিচ্ছিল একটি ছাত্রকে, মারতে মারতে ফেলে দিচ্ছিল কলেজেরই মধ্যে, আর ওরা কয়েকজন বান্ধবী কীভাবে ব্যারিকেড তৈরি করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল একটা, শুনতে পাই সেই বৃত্তান্ত। মনে পড়ে তাঁদের মুখ, যাঁরা বলছিলেন সবই ঠিকমতো চলছে এখন, রেলগাড়ি, অফিস-বাড়ি, কাঁটায় কাঁটায়। এ কাহিনী তাঁদের শোনালে তাঁরা চুপ করে থাকেন। শোনা গল্পে অতিরঞ্জন থাকে, বলেন তাঁরা। আর তাছাড়া, অল্পস্বল্প এইসব সংঘর্ষে কতটুকু আর প্রমাণ হয়? আপনাদের ছাত্রবয়সে দেখেননি কোনো সংঘর্ষ, কোনো খুন? ও তো আর একদিনে বন্ধ হবার নয়। কিন্তু পরিবর্তে দেখুন, আন্তর্জাতিক যে চক্রান্তে দেশের ভরাডুবি হতে পারত, কত সহজে তার থেকে আমরা উদ্ধার পেয়ে গেছি। বড়ো একটা স্বাধীনতার জন্য ছোটো ছোটো

কিছু স্বাধীনতাকে না-হয় মুলতুবিই রাখলেন কদিনের জন্য। সময়ের প্রতিকূলতাটাকে ভাবুন, আর ভাবুন কত সহজে আমরা পেরিয়ে আসতে পারছি তার ধকল।

এই কথাকেও মনে হয় ছুরির মতো। প্রেসিডেন্সি কলেজের পুরোনো পরিচিত সিঁড়িবারান্দা ভেসে ওঠে চোখের ওপর, কথাবলার অপরাধে কাউকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে মনে হয়, ফেলে দিচ্ছে ড্রেনে, আর মাইল মাইল, মনে হয়, শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে।

'আপাতত শান্তিকল্যাণ'

পেটের কাছে উঁচিয়ে আছো ছুরি
কাজেই এখন স্বাধীনমতো ঘুরি
এখন সবই শান্ত, সবই ভালো।
তরল আগুন ভরে পাকস্থলী
যে-কথাটাই বলাতে চাও বলি
সত্য এবার হয়েছে জমকালো।

গলায় যদি ঝুলিয়ে দাও পাথর
হালকা হাওয়ার গন্ধ সে তো আতর
তাই নিয়ে যাই অবাধ জলস্রোতে –
সবাই বলে, হা হা রে রঙ্গিলা
জলের উপর ভাসে কেমন শিলা
শূন্যে দেখো নৌকো ভেসে ওঠে।

এখন সবই শান্ত সবই ভালো
সত্য এবার হয়েছে জমকালো
বজ্র থেকে পাঁজর গেছে খুলে
এ-দুই চোখে দেখতে দিন বা না-দিন
আমরা সবাই ব্যক্তি এবং স্বাধীন
আকাশ থেকে ঝোলা গাছের মূলে।

১৬

রাধাচূড়া আর শান্তিকল্যাণ, দুটি কবিতাই ফিরে এল 'নট্‌ টু বি প্রিণ্টেড্‌' এই সরকারি শিলমোহর নিয়ে। ফিরবারই কথা, সরকার তাঁর সত্য রক্ষা করেছেন।

এমন নয় যে ছাপা হয়নি সে-লেখা, সেই পরিবেশেই। সেইটেই ছিল পরীক্ষা, এই হুকুমনামা অগ্রাহ্য করবার ঝুঁকি নেবার পরীক্ষা। যে-পত্রিকার সম্পাদক নিরুপায়ভাবে মেনে নিয়েছিলেন বা অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়েছিলেন এই নির্দেশ, সস্নেহে তিনি অন্য কোনো কবিতা চেয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু কী করে অন্য কবিতা দেওয়া যায় তখন, আর কেনই-বা দেব। আমারও নিরুপায় দশা জানাতে হলো তাই। শরৎকাল চলছে, এখানেওখানে চারদিকেই পত্রিকাপ্রকাশের মরশুম, অনেক তরুণ-প্রবীণ সম্পাদক ছোটোবড়ো নানা কাগজের জন্য লেখা চান, তাঁদের বলি আমার শর্তের কথা। শর্ত : রাইটার্সে পাঠানো চলবে না কবিতা, এবং যে-লেখা দেব তা ছাপবার ঝুঁকি নিতে হবে নিজেরই কাঁধে। ইতস্তত করে এড়িয়ে যান অনেকে। কিন্তু সকলেই যে পিছিয়ে যান তা নয়। শর্ত মেনেই কবিতাদুটি ছেপে 'লা পয়েজি' আর 'সাহিত্যপত্র'র সম্পাদক কৃতজ্ঞ রাখেন আমাকে, ভরসার কথা শেষপর্যন্ত সেজন্য কোনো বিপদ হয় নি তাঁদের।

এইসব দ্বিধাভয়ের সামনে প্রতিদিনই নতুন স্লোগানে ভরে উঠছে শহরগাঁয়ের পথ। আড়েআড়ে তাকিয়ে দেখছে লোকে, হয়তো-বা উপহাসও করছে গোপনে। খুববেশি উচ্চারিত হয় না সে-উপহাস, দেয়ালেরও যে কান আছে তা মনে রাখে সবাই।

কুড়িদফা কর্মসূচির ঘোষণা হয়ে গেছে দিল্লি থেকে। লোকের কানে জপমন্ত্র পৌঁছেছে : কাজ করো, কাজ। কেননা 'কঠিন পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।'

অনুশাসন-পর্ব নাম হয়েছে এর।

এবং সঞ্জয় গান্ধী ঘুরে বেড়াচ্ছেন শহরেগ্রামে। যে-কোনো সংকটের পরিচয় জানলেই তার আশু সুরাহার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন রাজকীয় সংবর্ধনার উত্তরে।

এবং আমরা চুপ করে আছি। কেননা আমরা স্বাধীন।

আমাদের উপহাসের বোধ কিংবা ইচ্ছেও স্তিমিত হয়ে আছে।

আন্দোলন দূরের। আন্দোলন স্তব্ধ। কেননা অনুশাসন-পর্ব চলছে এখন।

এইসব ভাবতে ভাবতে পথ চলছি একদিন,মৌলালির মোড়ে বাঁক নিতেই আরো একবার চোখে পড়ছে রাস্তার মাথায় আড়াআড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া স্লোগান : কঠিন পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

এবং সঞ্জয় গান্ধী ঘুরে বেড়াচ্ছেন

এবং দিল্লি থেকে প্রতিশ্রুতি শুনছি আমরা

আর স্লোগানটা আমার মাথায় উলটে যাচ্ছে পাক খেয়ে।

বিকল্প

নিশান বদল হলো হঠাৎ সকালে
ধ্বনি শুধু থেকে গেল, থেকে গেল বাণী
আমি যা ছিলাম তাই থেকে গেছি আজও
একইমতো থেকে যায় গ্রাম রাজধানী

কোনো মাথা নামে আর কোনো মাথা ওঠে
কথা ছুঁড়ে দিয়ে যায় সারসের ঠোঁটে।

আমার গাঁয়েই না কি এসেছিল রাজা
কখনও দেখিনি এত শালু বা আতর
নিচু হয়ে আঁজলায় চেয়েছি বাতাস
রাজা হেসে বলে যায় : ভালো হোক তোর।

কথা তবু থেকে যায় কথার মনেই
কঠোর বিকল্পের পরিশ্রম নেই !

১৭

প্রতিবাদ যে কেউ করছে না, তা অবশ্য নয়। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্রতীরা প্রতিবাদ করেছিলেন বলে মিসায় ধরা হয়েছে এর নেতাদের। দিল্লিতে জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ষাটজন ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরোনো যোদ্ধারা ঘোষণা করছেন তাঁদের বিক্ষোভ। কলকাতায় গৌরকিশোর ঘোষ বা জ্যোতির্ময় দত্ত জানাচ্ছেন তাঁদের সাহসিক প্রতিবাদ, লেখায় এবং আচরণে, এবং আক্রান্ত হয়েও তাঁরা ছড়িয়ে দিচ্ছেন বুলেটিন বা পত্রিকা, ছাপা হচ্ছে রাজনীতি-বিমুখ 'কলকাতা' পত্রিকার বিশেষ এক রাজনৈতিক সংখ্যা। সম্ভাব্য প্রতিবাদীদের অনেকদিন আগেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে জীবনের পুরোভূমি থেকে, আর ওরই মধ্যে পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা বলতে পেরেছেন যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ এখনই আর ফিরিয়ে দেওয়াসম্ভব নয়, বাক্‌স্বাধীনতা আজ নিছক অবান্তর কথা।

প্রতিবাদ আছে. তবুও কত সহজেই ঘটতে পারে এই যথেচ্ছাচার ! সঞ্জয় গান্ধীর বুলডোজার কত সহজেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে দিল্লিতে তুর্কমান গেটের সন্নিহিত বস্তি, কত সহজেই গুলি চলে তার বাসিন্দাদের বুকের ওপর। কে সঞ্জয় গান্ধী ? কিন্তু না, সেকথা বলবার আর উপায় নেই কোনো। আমরা মেনে নিয়েছি তাঁকে। বশংবদ হয়ে থাকাই আজ ভারতীয় নাগরিকের এক-মাত্র অধিকার।

অবশ্য, কথাটা কেবল তাঁকে নিয়ে নয়। কথাটা হলো সম্পূর্ণ এই প্রবণ-তাকে নিয়ে, এই মানসিকতাকে নিয়ে। একদিকে এই পরম দাম্ভিক মত্ততায় শাসন করবার উত্তেজনা, অন্যদিকে একটা বিপুল জড় অংশে তাকে মেনে নেবার বিকলতা। এ যে শুধু এই মুহূর্তেরই সংকট তা নয়, এ হলো আমাদের জীবনের নানা স্তরে সমস্ত সময়ব্যাপী সংকট।

এইসব ভাবনার ঘোরে, একদিন এক নির্জীব সরকার-স্তাবকের দেখা পাবার পর, একটু বাঁকা কৌতুক ঝিলিক দিল মনে, অকারণেই মনে এল হাতেমতাই-এর নাম, যেন দেখতে পেলাম তার সিংহাসনে-বসা চেহারা, ত্বরিতেই লেখা হয়ে গেল ছোটো একটি কবিতা।

সময়চিহ্নিত এই কবিতার কি কিছুদিন পরে আর মানে থাকবে কিছু ?

জরুরি অবস্থার প্রত্যাহার হয় যদি কখনো, তখন ? এই প্রশ্ন তুলেছিলেন এক বন্ধু। সত্যি যদি এই হয় যে সাময়িক একটা উত্তেজনা মিটিয়েই ফুরিয়ে যায় লেখা, কবিতার মূল্য তবে কতটুকু আর ? সেইরকমই কি লিখে বসেছি কিছু ?

অধ্যাপনা আমার জীবিকা। একদিন কথা আছে ক্লাস-টেস্ট নিতে হবে একটা। ক্লাসে এসে মুখেমুখে বলেছি প্রশ্নটা, ছেলেমেয়েরা শুরু করেছে লিখতে। বেশ গম্ভীর আয়োজন। আমার তো তখন আর কাজ নেই কিছুক্ষণ, ঘুরে বেড়াচ্ছি ঘরে। ডায়াস থেকে দেয়াল পর্যন্ত গিয়ে আবার যখন ঘুরেছি এই দিকে, চোখে পড়ে ব্ল্যাকবোর্ড। তাকিয়ে দেখি চক দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে সেখানে লেখা আছে সদ্যপ্রকাশিত সেই কবিতারই দুটি লাইন:

আমার বাঁচামরা তোমারই হাতে
স্মরণে রেখো বান্দাকে !

কে লিখেছিল ওটা জানি না, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে যেন এক নতুন পলক লাগল মনে। সত্যিই তো, এই মুহূর্তে, ক্লাসঘরের এই প্লাটফর্মে দাঁড়ানোর মুহূর্তে ছেলেমেয়েদের চোখে আমিই তো সেই হাতেমতাই, যার যে-কোনো স্বেচ্ছাচারের ওপর নির্ভর করে আছে তাদের ভবিষ্যৎ। অজ্ঞাত সেই রসিক ছেলেটির (বা মেয়েটির) প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করি মনে মনে। সে যেন চকিতে জানিয়ে দিল যে এ স্বেচ্ছাচার কোনো রাষ্ট্রীয় সমস্যা নয় শুধু ; এর ভিতরকার যে ব্যাপক নির্জীবতা, স্তুতিকাতরতা, ভয় আর শাসন—রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে তো ছড়ানো আছে আমাদের এই সমাজের, আমাদের পরিবারের, সমস্ত স্তরেই !

হাতেমতাই

হাতের কাছে ছিল হাতেমতাই
চুড়োয় বসিয়েছি তাকে
দুহাত জোড় করে বলেছি 'প্রভু
দিয়েছি যত দেখো নাকে।
এবার যদি চাও গলাও দেব
দেখি না বরাতে যা থাকে—
আমার বাঁচামরা তোমারই হাতে
স্মরণে রেখো বান্দাকে !

ডুমুরপাতা আজও কোমরে ঝোলে
লজ্জা বাকি আছে কিছু
এটাই লজ্জার। এখনও মজ্জার
ভিতরে এত আগুপিছু !
এবারে সব খুলে চরণমূলে
ঝাঁপাব ডাঁই-করা পাকে
এবং মিলে যাব যেমন সহজেই
চৈত্র মেশে বৈশাখে।'

১৮

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে বর্ধমান স্টেশনে। দেখতে পাই, সমস্ত প্লাটফর্ম জুড়ে বসে আছে শুয়ে আছে মানুষ, সঙ্গে তাদের যৎসামান্য সম্বল, আর মাছি আর কুকুর আর জঞ্জাল। থিকথিকে তার পুঞ্জ দেখে মনে পড়ে যায় পুরোনো শেয়ালদা স্টেশন, পঞ্চাশের শেয়ালদা, উদ্‌বাস্তুদের অস্থায়ী সেই বাস্তুভূমি শেয়ালদা। স্বাভাবিকই ছিল মনে পড়া, কেননা এরাও তাদেরই সগোত্র, হয়তো-বা তাদের উত্তরপুরুষ, আজও এরা খুঁজে বেড়াচ্ছে পা রাখবার সামান্য একটু জায়গা।

পুববাংলা একদিন যখন উথ্‌লে এসে পড়ে এই বাংলায়, পুনর্বাসনে তার বড়ো-একটা অংশকে তখন পাঠিয়ে দেওয়া হয় দণ্ডকারণ্যে, নতুন এক পত্তনের ভরসায়। কিন্তু সে কি পুনর্বাসন না নির্বাসন? এই প্রশ্ন সেদিন তুলেছিলেন প্রগতিভাবুক মানুষেরা, প্রগতিশীল দলগুলি। সে-প্রতিবাদ শোনেনি কেউ, সমস্ত বিক্ষোভের ব্যর্থতা মেনে নিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল দূরের দেশে, ভাষা আর সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে সরে গিয়ে নতুন জীবনের চেষ্টা করছিল তারা অবহেলার মাঝখানে।

যুগান্তর হয়ে গেছে তারপর। শুরু হয়ে গেছে পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল শাসন। দণ্ডকারণ্যের বিচ্ছিন্ন নিরুপায়তা থেকে এবার তবে হয়তো-বা ফিরে যাওয়া যাবে দেশে, ভেবেছিল তারা অনেকে, কিংবা হয়তো ভাবানো হয়েছিল তাদের। বড়ো বড়ো ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা তো শুধু খড়, অবোধভাবে এপথে ওপথে উড়ে চলে যায়। হাজার হাজার মানুষ এবার তাই উড়তে লাগল দেশের মুখে, যেন তাদের স্বরাজ এল এতকাল পরে! নিজের দেশে নিজের ঘর হবে বলে কোথায় কোন্ উড়ো খবর পেল তারা! কিন্তু সবকিছু নিয়ে এখানে পৌঁছে তারা দেখে, তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে শুধু পুলিশের লাঠি। নতুন তাণ্ডবে নতুন করে উৎখাত হলো সবাই, প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত হলো, আবার তাদের ধরতে হবে ফেরার পথ।

বর্ধমানে এই তাদের সেই প্রতিহত হবার ছবি। এই পর্যন্ত, এর পর আর এগোতে দেওয়া হয়নি এই দলটিকে, নামিয়ে নেওয়া হয়েছে গাড়ি থেকে। এবার এইখানে, অনির্দেশ্য ফেরার জন্য অনিশ্চিত প্রতীক্ষা।

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে বর্ধমান স্টেশনে, বিকেল হয়ে আসছে তখন। মাছি আর কুকুর আর জঞ্জাল, আর সেই থিকথিকে ভিড়েরই মধ্যে নিজের অস্থায়ী ছোটো বৃত্তটিতে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে, মুখের সামনে ভাঙা আয়না নিয়ে বিকেলের প্রসাধন করছে সে, মুখে ঈষৎ হাসি, চারপাশে কোথাও কিছু নেই বলে মনে হয় যেন। আদর নেই বলে, ফিরে যেতে হবে বলে যেন কিছুমাত্র ভাবনা নেই তার।

ছেড়ে দেয় ট্রেন। হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছি দরজায়, নিচের দিকে তাকিয়ে, পিছন দিকে ছুটতে থাকে লাইন। মনে পড়ে কদিন আগে, ওইরকমই এক বিরাট দলের ফিরে যাবার সময়ে, অবুঝ একজন কিছুতেই আর ফিরতে চায়নি বলে ঝাঁপ দিয়েছিল ট্রেনের দরজা থেকে। লাইনের নুড়িপাথরের পাশে ছুটন্ত ঘাসজমির ফালি দেখতে দেখতে মনে হলো একবার, পড়বার পর বুকের খুব কাছে এই মাটির একটুখানি ছোঁয়া তো সে তবে পেয়েইছিল—তার নিজের দেশের মাটির? নাকি কোনো পাথরকুচি তখন বিঁধে গিয়েছিল বুকে?

এই-যে আজ ট্রেনের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমি, পুববাংলার সেই আমিও তো হতে পারতাম 'সে'? পিছনে তাকিয়েও বর্ধমান দেখা যায় না আর, দরজা ছেড়ে ভিতরে এসে বসি, মনের মধ্যে ভর করে থাকে শুধু এই-এক ফিরে যাবার ছবি, এই উলটোরথের টান।

উলটোরথ

ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে ধানশিয়রে
গলার কাছে পাথরবাঁধা বস্তামানুষ

মাটির থেকে উঠছিল তার মাতৃভূমি
বুকের নিচে রইল বিঁধে বৃহস্পতি

ইচ্ছে ছিল তমালছোঁয়া দুঃখ ছিল
কিন্তু হঠাৎ টান দিয়েছে উলটোরথে

এসেছিলাম আমরা সবাই এসেছিলাম
বলতে বলতে ঝাঁপ দিল তাই অন্ধকারে

কামরাজোড়া অন্য সবাই চমকে উঠে
অন্নমুখের কৌতূহলে দেখল শুধু

ছন্দ আছে আসাযাওয়ার ছন্দ আছে
আর তা ছাড়া ধ্বংস তো নয় বরং এ যে

সবার কাছে লাথি খাবার পদ্মবুকে
দেশ নেই যার এইভাবে দেশ খুঁজে বেড়ায়

উলটোরথের ভিখিরি দেশ খুঁজে বেড়ায়
গলায় পাথর বুকের নিচে বৃহস্পতি।

১৯

দেশমনস্ক দীপ্ত এক তরুণী, অধ্যাপনা করেন কলকাতার এক কলেজে, প্রায়ই আসতেন একটি লেখা চাইবার জন্য। কোনো কবিতা নয়, চাইতেন এক গদ্য, যে-গদ্যে সময়ের দায় নিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তার কিছু পরিচয় ধরা থাকবে। আরো আরো কয়েকজনের এইরকম লেখা নিয়ে একটি সংকলন করবেন বলে ভাবছেন তিনি, 'মনে কি হয় না এখন খুবই দরকার তেমন-এক সংকলনের?'

কয়েকদিনের আসাযাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সহজেই হয়ে উঠলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু, সব বয়সের বন্ধু। লেখাটি পাবার পরও, ছাপা হয়ে যাবার পরও, ব্যাহত হলো না সেই বন্ধুতা। পরে একদিন জানলাম, আরো একটি লিখতে হবে আমাকে, আগেরটির অনুস্মৃতি হিসেবে। কেননা, বললেন তিনি, কারো কারো পছন্দ হলেও আগের লেখাটিতে তাঁর নিজের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয়নি, কিছুদূর এগিয়েই সেখানে বন্ধ হয়ে গেছে কথা, খুলে বলা হয়নি সব। 'কী বলা হয়নি, খুলে?' 'কাজের মধ্যে ঝাঁপ দেবার কথা। খোলা গলায় আপনারা ডাক দিচ্ছেন না কেন সবাইকে? সবকিছু ছেড়ে বিপ্লবের কাজে এগিয়ে আসবার ডাক, কাজের ডাক? সে-দায়িত্ব কি আপনাদের নয়?' 'কিন্তু কাজের ধারণা তো সকলের সমান নয়। আর তাছাড়া, নিজে সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে আসবার আগে ও-রকম ডাকের কথা কেমন করেই-বা বলতে পারি আমি?' 'ঠিক। সেইজন্যই তো বলছি, নিজেরাও ছেড়ে আসুন বাঁচবার এই ধরন। এখনো কি ইতস্তত করবার সময় আছে? দেয়ালের লেখা পড়তে পারছেন না? এখনো কি সময় হয়নি?' 'হয়তো হয়েছে, কিন্তু আমি তত নিশ্চিত নই এখনো।' 'দেখুন, ভেবে দেখুন তবে আরো। পরে আবার আসব আমি।'

কিন্তু আসেননি আর ভাবনা জানতে, বা লেখা নিতে। আমাদের আত্মবিরোধের ধরনটা বুঝে নিয়ে হয়তো-বা কোনো আমূল ধিক্কারবশেই আসেননি আর, উৎসাহ পাননি সংকলনের প্রস্তাবিত সেই দ্বিতীয় খণ্ড নিয়েও। সত্তরের দশককে মুক্তির দশক করে তুলবার ব্রতে মিলে গিয়েছিলেন যাঁরা, শুনেছিলাম যে তাঁদেরই মতো পথে বেরিয়ে গেছেন তিনি। সময় হয়েছে, সময় হয়েছে, এ-রকমই একটা চঞ্চল ধ্বনিতে তখন ভরে আছে বাতাস,

মনে পড়ে 'নটীর পূজা'য় মালতীর কথাগুলি, একটু ভিন্ন তাৎপর্যে : 'আজ বাতাসে বাতাসে যে আগুনের মতো কী এক মন্ত্র লেগেছে।' মনে পড়ে : 'সেদিন আমার ভাই চলে গেল। তার বয়স আঠারো। হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেম, কোথায় যাচ্ছিস ভাই। সে বললে, খুঁজতে।'

অনেকদিন আর খবর পাইনি তাঁর। পরে একদিন জেনেছি তাঁর কারা-লাঞ্ছনার খবর। তাঁর উচ্চারিত-অনুচ্চারিত সমস্ত ধিক্কার ছড়িয়ে পড়তে থাকে সেই খবর থেকে।

শেষ হয়ে আসতে থাকে সত্তরের দশক। দেয়ালে মুক্তির লেখাগুলি মুছে আসে অল্পে অল্পে, নতুন লেখার জন্য পথ করে দিয়ে। স্মৃতির মধ্যে শুধু হানা দিতে থাকে সেইসব মুখ আর তার স্বপ্নের ইতিহাস।

শ্লোক

সেই মেয়েটি আমাকে বলেছিল :
সঙ্গে এসো, বেরিয়ে এসো, পথে।
আমার পায়ে ছিল দ্বিধার টান
মুহূর্তে সে বুঝেছে অপমান
জেনেছে এই অধীর সংকটে
পাবে না কারও সহায় একতিলও—
সেই মেয়েটি অশথমূলে বটে
বিদায় নিয়ে গাইতে গেল গান।

আমি কেবল দেখেছি চোখ চেয়ে
হারিয়ে গেল স্বপ্নে দিশাহারা
শ্রাবণময় আকাশভাঙা চোখ।
বিপ্লবে সে দীর্ঘজীবী হোক
এই ধ্বনিতে জাগিয়েছিল যারা
তাদেরও দিকে তাকায়নি সে মেয়ে
গ্লানির ভারে অবশ ক'রে পাড়া
মিলিয়ে গেল দুটি পায়ের শ্লোক।

২০

যাদবপুরে যারা পড়তে আসে, তাদের মধ্যে কিছু কিছু থাকে গ্রাম থেকে সদ্য উঠেআসা যুবক, এই প্রথম তারা কোনো জাঁকজমকের শহরকেন্দ্রে এসে পৌঁছল। একটা ভীরু কাঁপুনি তাদের সমস্ত চোখেমুখে লেগে থাকে তখন, নিজেকে সম্পূর্ণ দূরত্বেপ্রচ্ছন্ন রাখবার আয়োজনে বিব্রত থাকে তারা। তারপর কেউ কেউ মানিয়ে নেয়, পরিণত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কেউ-বা পারে না তা, বরং নতুন এই আপোজানা সংস্কৃতির সংঘর্ষে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, উন্মাদ হবার ঘটনাও ঘটে যায় কখনোকখনো।

এদের মুখের দিকে তাকালেই মনে পড়ে নিজের অল্পবয়সের কথা। মনে পড়ে সে-আমলের প্রেসিডেন্সি কলেজে পরম অভিজাত পরিবেশের মধ্যে কতদূর অসহায় পরিত্যক্ত লেগেছিল নিজেকে, পদ্মাপারের ছোটো রেলকলোনি থেকে পৌঁছনো এই এক অর্বাচীন আমি। আবরণে আচরণে উচ্চারণে যে দূরত্বের বিচ্ছেদ তৈরি হয়েছিল সেদিন, ভিতরে ভিতরে সেই ভীরুতা আজও কাটিয়ে উঠতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এদের মুখচ্ছবিতে তাই নিজেরই আদল দেখতে পাই।

আটাত্তর সালে একবছর শান্তিনিকেতনে দিন কাটাবার সময়েও এমন দু-একটি ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছিল, মনে পড়ে। সরল, অপ্রস্তুত হাসি নিয়ে তাদের মধ্যে একজন বলেছিল, গ্রামে তার বাবা মুদিখানা চালান বলে সহ-পাঠিনীরা কৌতুক করে, সবার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে তার খুব সংকোচ হয় তাই।

সবাই নিশ্চয় এমন নয়। কিন্তু এ-রকম দু-একটি ঘটনার ইঙ্গিত জানলেও ব্যাপক ব্যর্থতায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে মন। ব্যর্থতা, কেননা এই কি ছিল রবীন্দ্র-নাথের মানুষগড়ার কল্পনা? এই কি তার পরিণাম? রবীন্দ্রনাথ যখন কোনো ব্যক্তিনাম না হয়ে গোটা এক জীবনরূপের পরিচয় হয়ে আসেন—তখন এই কি হবে সেই রূপের প্রকাশ?

ফিরে এসেছি শান্তিনিকেতন থেকে, কেটে গেছে তারপর কয়েক বছর। কিন্তু ফুরোয়নি সেইসব মুখের অবিরাম আসাযাওয়া। তারপর একদিন, সেটা বোধহয় একাশি সালের কোনো সকাল, কাগজ খুলে জানি : গ্রাম থেকে আসা

তরুণ একটি ছাত্র গলায় দড়ি দিয়েছে শান্তিনিকেতনে, পঁচিশে বৈশাখের ভোর-বেলা। পঁচিশে বৈশাখেই? তবে এই কি তার প্রতিবাদ, এই দিনটিকে নির্বাচন করে নেওয়া? আত্মঘাতের আগে, বাবার জন্যে একটি চিরকুট রেখে গেছে সে, ভুল করে যেন ভাইকেও এখানে না পাঠান তার বাবা।

নিজের মুখ থেকে শুরু করে আমার-দেখা সবকটি ওই গ্রামীণ মুখ তখন একসঙ্গে লাফদিয়েওঠে চোখের সামনে। বইয়ের পাতা থেকে কোনো ভৎর্সনা যেন সজীব হয়ে ভেসে আসতে থাকে কানে: কাকে তোমরা বাঁচাতে পারলে? কাকে?

আত্মঘাত

এখানে আমাকে তুমি কিসের দীক্ষায় রেখে গেছ ?
এ কোন্ জগৎ আজ গড়ে দিতে চাও চারদিকে ?
এ তো আমাদের কোনো যোগ্য ভূমি নয়, এর গায়ে
সোনার ঝলক দেখে আমাদের চোখ যাবে পুড়ে।
বুঝি না কখনো ঠিক এরা কোন্ নিজের ভাষায়
কথা কয়, গান গায়, কী ভাষায় হেসে উঠে এরা
পিষে ধরে আমাদের গ্রামীণ নিশ্বাস, সজলতা,
কী ভাষায় আমাদের একান্ত বাঁচাও হলো পাপ।
আমার ভাইয়ের মুখ মনে পড়ে। গ্রামের অশথ
মনে পড়ে। তাকে আর এনো না কখনো এইখানে।
এইখানে এলে তার হৃদয় পাণ্ডুর হয়ে যাবে
এইখানে এলে তার বিশ্বাস বধির হয়ে যাবে
বুকের ভিতরে শুধু ক্ষত দেবে রাত্রির খোয়াই।
আমার পৃথিবী নয় এইসব ছাতিম শিরীষ
সব ফেলে যাব বলে প্রস্তুত হয়েছি, শুধু জেনো
আমার বিশ্বাস আজও কিছু বেঁচে আছে, তাই হব
পঁচিশে বৈশাখ কিংবা বাইশে শ্রাবণে আত্মঘাতী।

২১

প্রথম পাতা নয়, খবরের কাগজের ভিতরের পাতায় দু-তিন লাইনের ছোট্ট খবরগুলিতেই থাকে আমাদের পরিচয়। প্রথম পাতায় শুধু মন্ত্রীগড়ার খবর, আমলাবদলের খবর, রাষ্ট্রসংঘাত আর আত্মসংঘাতের খবর। ভিতরে মুখ ঢেকে থাকে গাঁয়ের সেই স্বামীর কথা, স্ত্রী হাসিমুখে ঘাসসেদ্ধ খেতে পারেন বলে যিনি নিশ্চিন্ত। থাকে সেই মায়ের কথা, সাংসারিক সুরাহার জন্য মেয়েকে যিনি শেষ পর্যন্ত বিক্রি করে দেন অন্যের হাতে। থাকে সেই বধূর কথা, শিশু-সন্তানকে ভাসিয়ে দিয়ে যিনি জলে ঝাঁপ দেন, স্বামীর ঘরের গঞ্জনা আর অবজ্ঞা থেকে বাঁচবার জন্য।

এমনি এক যৎসামান্য খবর ছাপা হলো একদিন, বিরাশি সালের গোড়ায়, মালতীর খবর। রবীন্দ্রনাথের নয়, এ আরেকরকম সাধারণ মেয়ে, হাজতে বন্দী হয়ে পড়ে আছে এ অনেকদিন। কতদিন? তা ঠিক মনে নেই কারো। হতে পারে সাতবছর। হাজতে কেন? শাস্তি হয়েছে তার? শাস্তি হয়নি ঠিক, সে বিচারাধীন মাত্র। তবে, হাজতে নিয়ে যাবার পর পুলিশ ভুলে গিয়েছে তার কথা। কত-কতই তো ধরে নিয়ে যায় এমন। মনে কি থাকে সবার নাম? থাকা কি সম্ভব? কিন্তু হঠাৎ কী করে টের পাওয়া গেল এই-খানে আছে এক মালতী, তার বিচার করতে ভুলে গিয়েছে পুলিশ। কী তার অপরাধ সেটা জানবার জন্য অনেক বছর অপেক্ষা করে আছে সে।

জানে না কি অপরাধ? হ্যাঁ, মনে পড়ে একটু। তখন ছিল তার বারো-তেরো বছর বয়স। ঘুরে বেড়াত এয়ারপোর্টের কাছে। একদিন, কী করে, ঢুকে পড়েছিল তার ভিতরেও। মেঝেতে পড়ে থাকা খাবারের টুকরো কুড়িয়ে মুখে দিচ্ছিল সে। তখনই পুলিশ তাকে ধরে।

তারপর? তারপর থেকে সে এইখানে, হাজতে। বাইরের পৃথিবীর কথা এখন মনেও পড়ে না তার, এই সাত বছর পর। ভাবতেও চায় না কিছু। তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবার? কোথায় যাবে সে, ছেড়ে দিলে? তার চেয়ে এইখানেই আছে ভালো।

কয়েকমাস কেটে গেছে এ-খবর জানবার পর। কাগজের ওপর কাগজের স্তূপ চাপা পড়ে গেছে। স্মৃতির ওপর বিস্মৃতির স্তূপ। দু-একদিন শিলিগুড়িতে

কাটাবার পর ফিরে আসছি ট্রেনে। একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। খাবার হেঁকে বেড়াচ্ছে প্লাটফর্মে, কামরাতেও উঠে এসেছে কেউ কেউ। জানালা দিয়ে ভুক্তাবশেষ ছুঁড়ে ফেললেন একজন, দৌড়ে এল ইজেরপরা ছেলেমেয়ে কয়েকটি, আর সঙ্গেসঙ্গে এক রেলকর্মী তাড়া করল তাদের : 'আবার এসেছিস, আবার—ওঃ, এদের নিয়ে—'

ভেসে উঠল দশ বছরের পুরোনো বোলপুরের এক ছবি, একটি ছেলে পায়ের নিচে ছড়িয়ে পড়া সিঙারার টুকরো কুড়িয়ে নিচ্ছিল বলে অসুবিধে হচ্ছিল এক যাত্রীর। মনে পড়ল মালতীর কথা। এ কিছু নতুন ছবি নয়। এ-রকম মালতী-দের তো দেখতেই হয় রোজ।

পাশে এক যাত্রী বলেন : সত্যি, লজ্জা হয় এদের দেখলে! তাই না?

ছেড়ে দিল ট্রেন। কিন্তু আমারও কি লজ্জা হলো? আমাদের? ট্রেনের গতি বাড়ছে। একটা ছন্দ পাচ্ছি মনে হয়। মনে পড়ছে মালতীর কথা। এয়ারপোর্টের কথা। মনে পড়ছে পুলিশের কথা আর আমাদের কথা।

লজ্জা

বাবুদের লজ্জা হলো।
আমি যে কুড়িয়ে খাব
সেটা ঠিক সইল না আর
আজ তাই ধর্মাবতার
আমি এই জেলহাজতে
দেখে নিই শাঠ্যে শঠে।

বাবুদের কাঁচের ঘরে
কত-না সাহেবসুবো
আসে, আর দেশবিদেশে
উড়ে যায় পাখির মতো –
সেখানে মাছির ডানায়
বাবুদের লজ্জা করে!

আমি তা বুঝেও এমন
বেহায়া শরমখাকী
খুঁটে খাই যখন যা পাই
সুবোদের পায়ের তলায়।
খেতে তো হবেই বাবা
না খেয়ে মরব না কি!

বেঁধেছ বেশ করেছ
কী এমন মস্ত ক্ষতি!
গারদে বয়েস গেল
তা ছাড়া গতরখানাও
বাবুদের কব্জা হলো –
হলো তো বেশ, তাতে কি
বাবুদের লজ্জা হলো?

২২

বাড়ি বাড়ি ঘুরে এ-পাড়ায় ঠিকে কাজ করে কদম। সে পৌছলে, ঘড়ি না দেখেও বুঝতে পারি এখন কাঁটায় কাঁটায় কটা।

একদিন সে ঝাঁটা হাতে বসবার ঘরে ঢুকতেই পারিবারিক আড্ডা ভেঙে গেল, তার কাজের সুবিধের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে সবাই উঠে এল নিজের নিজের আসন থেকে। কদম অবশ্য এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করে না। মেঝেতে ঝাঁটা বুলোতে বুলোতে সহাস্যে বলল সে: 'আমি যেন পুলিশ। আমি ঢুকলাম, আর দিদিরা মাসীমা সব ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল!'

উৎপ্রেক্ষায় কথা বলছে কদম, কিন্তু তার উপমান হলো পুলিশ। সে জানে পুলিশ এলেই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। কেননা তার জীবনের ইতিহাস শুধু পালানোরই ইতিহাস।

দশ বছর আগে স্বামী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে এসেছে কলকাতায়, বাংলাদেশ থেকে, জীবিকার খোঁজে। এখানেওখানে ঝুপড়ি বেঁধে থাকে সবাই মিলে, ঠিকে কাজের পয়সায় মেয়ের বিয়ে দেয়, ইস্কুলে দেয় ছেলেকে। আর সে যখন এসে পৌছয়, ঘড়ি না দেখেও বুঝতে পারি এখন কাঁটায় কাঁটায় কটা।

একদিন বিকেলে জানায়, পরদিন সে আসতে পারবে না। কেবল পরদিন নয়, হয়তো দু-তিনদিন। কেন, যাবে কোথাও? 'ওই-যে, ঘর ভেঙে দেবে আমাদের, কোথায় যাব ঠিক তো নেই।' 'ঘর ভেঙে দেবে? কে?' 'বলল তো সবাই, পুলিশ আসবে কাল, থাকতে দেবে না এখানে, বলেছে।' 'কোথায় যাবে?' 'ঠিক তো নেই। সবাই যেখানে যাবে, আমরাও সেখানে যাব। বারে বারেই পুলিশ আসে। এই তো কদিন আগে তুলে দিল খালধার থেকে। এলাম এখানে। বলে, এখানেও না কি থাকা যাবে না।'

ঠিকই, শহরের একটা বিধি আছে। যে-কেউ যে-কোনো জায়গায় এসে বসতি শুরু করবে,পরিকল্পিত কোনো শহরে তো সেটা হবার কথা নয়। ঠিকই। কিন্তু এরা কী করবে? কখনো খালের পাশে, কখনো ইস্টার্ন বাইপাসের সীমান্তে, কখনো কোনো ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ির তলায় থাকতে পেলেই যথেষ্ট খুশি এরা। কিন্তু তেমনও তো কোনো জায়গা হতে পারে না নিয়মমতো,

স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য এবং সুবিধের কথা যদি ভাবি।

কদম চলে যায়। আমাদের মনে অনিশ্চয়ের একটু উদ্‌বেগ থেকে যায়। এমন হতেও পারে যে ওর শোনা কথাটা তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। এখন যেখানে আছে ওরা, তাতে এই মুহূর্তেই তো কারো অসুবিধে নেই কিছু। গুজবে ভুল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে অনেক সময়ে। এও হয়তো তেমনি কোনো গুজব। এ কি হতে পারে যে অকারণে তুলে দেবে ?

পরদিন সকালে, পুবখোলা বারান্দায় এসে দেখি, সামনের ছোটো মাঠের ওপর বসে আছে নানা বয়সের মেয়ে, কয়েকটা দরমার বেড়া, কয়েকটা পুঁটুলি, টুকরো জীর্ণ সুটকেসও দু-একটি। ওইরকমই কিছু ভার কাঁখে নিয়ে কদমও এগিয়ে আসছে সেই দলের মধ্যে। দূর থেকে দেখতে পায় আমাদের। একটু হেসে বলে : আজ আর যেতে পারব না। এখন এইখানেই সব আছি। ওরা সব খুঁজতে গেছে অন্য কোথাও থাকতে পারি কি না।

এরই মধ্যে, মাঠের ওপর, উনুন ধরিয়ে নিয়েছে কেউ কেউ। নিছক শিশুরা পা ছড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে কোনো প্রতীক্ষায় আছে। বাজারের দিকে হট্টগোল শুনে নেমে যাই বিলীয়মান ঝুপড়িগুলির সামনে পুলিশ অফিসারদের কাছে। পুরুষবাসিন্দারা কেউ কেউ তখনো দাঁড়িয়ে আছে পাশে, গুছিয়ে তুলছে তাদের ক্ষীণ গৃহস্থালি। কিন্তু আমার কেবলই মনে পড়ছে কদমের হাসি। তার অভ্যাস হয়ে গেছে মনে হয়। সে বলেছিল বটে 'এ-রকম তো কতবার হলো।' মনে মনে আমি কি তাকে সান্ত্বনা জানাতে গিয়েছিলাম ? আমার সান্ত্বনা দিয়ে সে কী করবে ? যতবার তাকে তুলে দিক, ততবারই সে অন্য কোথাও গিয়ে বসবে। কেননা বাঁচতে তো তাকে হবেই, তার নিজের জোরে।

ফিরে আসছি যখন, কদমের ওই মুখচ্ছবি যা বলতে পারত, তার ধ্বনিগুলি যেন পৌঁছতে থাকে কানে। কোথা থেকে একটা স্পর্ধাই এসে পৌঁছয়।

ভিখিরির আবার পছন্দ

থাক সে পুরোনো কাসুন্দি
যুক্তিতর্ক চুলোয় যাক
যেতে বলছ তো যাচ্ছি চলে
ভাঙবার শুধু সময় চাই।

ভাঙবার শুধু সময় চাই।
এ রাস্তা থেকে ও রাস্তায়
হব কদিনের বাসিন্দা
কে না জানে সব অনিত্য।

কে না জানে সব অনিত্য
নিয়ে যাই তাই খড়কুটো
বেঁচে যে রয়েছি এই-না ঢের
ভিখিরির আবার পছন্দ!

ভিখিরির আবার পছন্দ
ঠিকই পেয়ে যাব যে-কোনো ঠাঁই
আবারও ভাঙার প্রতীক্ষায়
কেটে যাবে দিন আনন্দে।

কেটে যাবে দিন আনন্দে
ভাসমান সব বাসিন্দার।
জীবন তো একই কাসুন্দি
ভিখিরির আবার পছন্দ!

২৩

ত্রিবান্দ্রমে গিয়েছি কিছুদিন আগে, দেশের অন্য অনেক অঞ্চল থেকে এসেছেন অন্য কয়েকজন কবি। অসমীয়া তেলুগু কন্নড় মালয়ালম আর হিন্দী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষাও। আছেন মুল্‌করাজ আনন্দ্‌। প্রতিমুহূর্তে কথা বলছেন তিনি অস্থির যুবকের মতো, বলছেন আমাদের সমস্ত দেশটারই কথা। স্বভাবতই, কথা চলছে ইংরেজিতে।

ছিল কুমারন্‌ আসানের জন্মজয়ন্তী। সমুদ্রের একেবারে ধারে, তার জলের ধ্বনি আর তীরবর্তী নারকেলগাছের মর্মর শুনতে শুনতে, কখনো-বা দেখতে দেখতেও, কবিলেখকদের মঞ্চসভা চলছে একটা, সাত-আটশো সাধারণ গ্রামবাসীর সামনে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুনছে তারা, কেননা তাদের প্রিয়, তাদের আপনজন এক কবির এই জন্মজয়ন্তী আজ।

আয়োজনকারীরা আমাদের ফিরিয়ে আনছেন যখন, পাশেই চলছিল মালয়ালম কবিদের গীতাশ্রয়ী কাব্যপাঠ। কিন্তু শুনবার সময় নেই আর, তাছাড়া কীইবা সেখানে বুঝব। কবিতার সুর শুনে হাসলেনও কেউ কেউ। হয়তো সারাদিনের ক্লান্তির জন্য, বুকের মধ্যে একটু কষ্ট হতে থাকে।

পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পথে মুল্‌করাজ আবারও তুললেন দেশেরই শতচ্ছিন্নতার কথা, আমাদের সংহতির কথা। পাঞ্জাবের কথা। আসামের কথা। গাড়ি চলেছে সুন্দর পথ ধরে। সমুদ্রের ফেনা চকিতে চকিতে দেখা যায়। ওরই মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে শব্দগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঘোরের মতো লাগে।

অন্য কিছু কিছু শব্দও এসে পেঁছিতে থাকে কানে। কিন্তু খুব যে স্পষ্ট তা নয়। হোটেলে পেঁছিতে চাই তাড়াতাড়ি।

ভুলে যাই তার পর। ফিরে আসি কলকাতায়।

তারপর একদিন, যাদবপুর যাবার পথে, পুনর্জন্ম হতে থাকে যেন সেই শব্দগুলির। এবার একটু স্পষ্ট। কিন্তু যদি হারিয়ে যায় আবারও? কলেজ-প্রাঙ্গণে গিয়ে পেঁছিলে সেটা হওয়াই তো সম্ভব।

আগের স্টপে নেমে যাই বাস থেকে।

দেশ আমাদের আজও কোনো

জঙ্গলের মাঝখানে কাটা হাত আর্তনাদ করে
গারো পাহাড়ের পায়ে কাটা হাত আর্তনাদ করে
সিন্ধুর স্রোতের দিকে কাটা হাত আর্তনাদ করে
কে কাকে বোঝাবে কিছু আর
সমুদ্রে গিয়েছে তার ঢেউয়ের মাথার থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
আলের ভিতর থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
চূড়া বা গম্বুজ থেকে হাজার হাজার ভাঙা হাড়
তোমার চোখের সামনে লাফ দিয়ে আর্তনাদ করে
সমবেত স্বর থেকে সব ধ্বনি মেলানো অকূলে
কণ্ঠহীন সমবেত স্বর
ধড় খুঁজে আর্তনাদ করে
হৃৎপিণ্ড চায় তারা শূন্যের ভিতরে থাবা দিয়ে
ধ্বংসপ্রতিভার নাচে আঙুলের কাছে এসে আঙুলেরা আর্তনাদ করে
জলের ভিতরে কিংবা হিমবাহ চূড়ার উপরে
কে কাকে বোঝাবে কিছু আর
অর্থহীন শব্দগুলি আর্তনাদ করে আর তুমি তাই স্তব্ধ হয়ে শোনো
দেশ আমাদের আজও কোনো
দেশ আমাদের আজও কোনো
দেশ আমাদের কোনো মাতৃভাষা দেয়নি এখনো।

২৪

ঘুমভাঙা বিছানায় কাগজের বড়ো হরফটা চোখে পড়ে আগে। এপিঠ ওপিঠ সবটা একবার দেখে নিয়ে তারপর বিবরণে মন দিই। কিন্তু সেদিন, সাতাশে জুলাই, খবরেরও আগে সিকিপাতাজোড়া বিজ্ঞাপনের ভাষায় থমকে গেল চোখ। আফ্রিকার খরাকবলিত শিশুদের সাহায্যের জন্য স্টার সুপারস্টাররা নাচবেন ইনডোর স্টেডিয়ামে, তাই জানানো হয়েছে উঁচুমানের টিকিটের হার। মানবিক এই ত্রাণেচ্ছা, ব্যবহারিক উপযোগিতায় ভরপুর, কিন্তু লক্ষ্য আর পদ্ধতির কী সুদূর বিচ্ছেদ! পাতা উলটে চলে যাই। ছয়ের পাতায় খবর এক নিগৃহীত কিশোরীর। ও. সি.-র বাড়ির এই পরিচারিকার গায়ে ফুটন্ত জল ঢেলে দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী, না জানিয়ে একটা বাসি রুটি বুঝি সে খেয়ে ফেলেছিল। মেয়েটি এখন হাসপাতালে। না, এসব খবর পড়া যায় না আর, পড়ব না আর কোনোদিন। চোখ নামিয়ে নিই। খবর, মালদহে দুটি খুন। মালদহে দুটি খুন? ওপরে চোখ তুলি আবার, আগেরটির শিরোনামে। 'পরিচারিকার নিগ্রহ / ও. সি.-র স্ত্রী ধৃত' নিচে, 'মালদহে দুটি খুন।' উদ্ভট! অবাস্তব আর উদ্ভট সময় চলছে একটা, অথচ তার খবর কেমন ছন্দে ছন্দে আসে! কাগজের হেডলাইন কি ছ-মাত্রায় সাজানো থাকে? লক্ষ করিনি তো আগে। হেডিংদুটো তালে তালে পৌঁছে যায় মাথায়। পাতা ওলটাই আবার। আ, কী আশ্চর্য সহাবস্থান। খবর পড়ছি না আর, শুধু অক্ষর দেখছি, ছন্দে ছন্দে পাক খাচ্ছে বিপরীত নানা ছবি। স্টার, সুপারস্টার। কয়েকদিন আগে বাজারে সংলাপ শুনেছিলাম তাদের রোমাঞ্চকর কসরৎ নিয়ে। তালের মধ্যে ভিতরে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে শুধু বিস্তৃতপড়া ওই একটিমাত্র খবর, সেই মেয়েটির, কোমরের নিচ থেকে সর্বাঙ্গ যার পুড়ে গেছে, যার বোন কাজ করে পাশের বাড়িতে। কিন্তু না, ওটা ভাবব না। খবর চাই। জাতীয়। আন্তর্জাতিক। সৌন্দর্যচর্চা।

উঠে বসি তাড়াতাড়ি। দুচারটে শব্দ এদিকওদিক করে নিলে তো সংবাদই মূলত ছন্দ হয়ে ওঠে, ছন্দে ছন্দে জাগতে থাকে কত চমকপ্রদ সহাবস্থান!

খবর সাতাশে জুলাই

পরিচারিকার নিগ্রহ—ও. সি.-র স্ত্রী ধৃত
মালদহে দুটি খুন
গর্বাচভকে রেগন দিলেন চিঠি
পারমাণবিক সাহায্য নিয়ে ফ্রান্স-পাক কথা হবে
আফ্রিকাজোড়া বিভীষিকাময় খরাকবলিত শিশুদের
মুখ ভেবে আজ ইনডোরস্টেডিয়ামে
সুপারস্টার
স্টার
সুপারস্টার
ধুম তাতা তাতা থৈ
কিশোরীর নাকি হাতটান ছিল হাতটান
গায়ে তাই ঢেলে দিয়েছে গরম জল
অবশ্য তাকে দেখতেও যায় দুবেলা হাসপাতালে
ধুম তাতা তাতা থৈ তাতা তাতা থৈ
৬৬০ জন গেরিলা শান্তিশিবিরে
দেখামাত্রই গুলি কারফিউ পশ্চিম দিল্লিতে
ভারত হারাল দক্ষিণ কোরিয়াকে
ফিগার কীভাবে রেখেছেন তার রহস্য বলা হবে এ-কাগজে
আরো বলা হবে মিলনের রূপরেখা
জেলাকংগ্রেসে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে
বোন তারা দুটি বোন তারা শুধু খেতে চায় রুটি চায়
এমন তো কিছু মারাও হয়নি ফোস্কা পড়েছে গায়ে
পুড়ে গেছে শুধু কোমরের নিচ থেকে
ও সি.-র মা ও স্ত্রী
আপাতত আছে জামিনে, তাছাড়া
আড়াইশো গ্রাম হেরোইন হাতে ধরা পড়ে শুধু একজন, আর
খরাকবলিত রহস্য নিয়ে নাচ হবে আজ ধুম তাতা তাতা ইনডোরস্টেডিয়ামে!

২৫

তখন আমরা ব্যস্ত আছি রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশ বছর নিয়ে ; তখন আমরা ব্যস্ত আছি রংভরা উৎসবের আয়োজনে। সরকারে বিশ্বভারতীতে প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে তখন গূঢ় প্রতিযোগিতা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। আমরাও আছি সেইসঙ্গে। আরো নানা কাজের মধ্যে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনায় চঞ্চল আছি আমি, তার প্রস্তুতিতে চকিতে চকিতে দু-একটি নতুন তথ্য হাতে পেয়ে বেশ উত্তেজিত। জালিয়ানওয়ালাবাগ নৃশংসতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদের কথা জানেন সবাই, জানেন যে পরের বছর লণ্ডন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি প্যারিসে, বিলেতের পার্লামেণ্টে জালিয়ানওয়ালাবাগ বিষয়ে সরকারি বক্তব্য জানবার পর। কিন্তু জানতাম না প্যারিসে যাবার সঙ্গেসঙ্গেই প্রকাশ্য যে ভাষণ দেন তিনি, তা ছিল ব্রিটিশেরই এই বর্বরতা বিষয়ে। জানতাম না যে কিছুদিন পরে আমেরিকাতে পৌঁছে অসহযোগ আন্দোলন-সম্ভাবনাকে তিনি বলেন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের ঐক্যবদ্ধ উত্থান, যদিও, ঠিক তখনই বন্ধু অ্যানড্রুজকে লিখছেন এর বিপজ্জনক সীমাবদ্ধতার কথা। প্রদর্শনীতে এইসব তথ্যের প্রতিফলন হবে কীভাবে, আমরা তখন ভাবছি সেই কথা। ভাবছি এ জয়ন্তীকে তাৎপর্যময় করবার কথা। আর, ঠিক এইরকম এক সময়ে, পাঞ্জাব থেকে নয়, বিহার থেকে ছুটে এল এক খবর। ন-কাঠা জমির সমস্যা নিয়ে তেইশজন মানুষকে গুলি করে মেরেছে পুলিশ, আরওয়ালে, তিনদিক ঘিরে এক গান্ধীমাঠে, এপ্রিলের উনিশ তারিখ।

আবার এপ্রিল, জালিয়ানওয়ালাবাগের এপ্রিল। আবার সেই ঘিরেফেলা, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘের। জয়ন্তী তাৎপর্য পেয়ে গেল বলে মনে হয়! এগিয়ে আসছে আরো এক জয়ন্তী এবার, পয়লা মে-র শতবর্ষ।

প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন হয়ে গেছে। উনিশে মে সন্ধ্যায় প্রকাশ্যে কথা বলব রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে ; সেইদিনই বিকেলে স্টুডেণ্টস হলে ছিল আরওয়ালের গণহত্যা বিষয়ে এক প্রতিবাদসভা। বিহার থেকে এসেছেন এক-জন রাজনৈতিক কর্মী, বিশদ বিশ্লেষণে তিনি জানাচ্ছেন উনিশে এপ্রিলের ঘটনা, তার পটভূমি, জানাচ্ছেন যে এ-রকম আরো অনেক ঘটনা-পরম্পরার জন্য তৈরি থাকতে হচ্ছে তাঁদের, তাঁরা জানেন যে এখানেই শেষ নয়। সামন্ত-

দের বর্বরতা সরকার আর পুলিশের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে যেখানে এসে পৌঁছেছে আজ, তাতে আরওয়াল কোনো একক উদাহরণ হয়ে থাকবে বলে মনে হয় না। পুলিশ ছাড়াও তাদের আছে নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনী, কিন্তু না, গুণ্ডা নয়, তাদের এরা সংগঠিত ভাবেই নাম দিয়েছে সেনা হিসেবে। ভূমিসেনা ব্রহ্মর্ষি-সেনা লোরিকসেনা—এমনকী কারো ব্যক্তিগত নিজস্ব নামে সত্যেন্দ্রসেনা নামে তৈরি হয়ে আছে হিংস্র বাহিনী, যে-কোনো স্বাভাবিক অধিকারকে লুণ্ঠন করে নিতে যাদের কোনো দ্বিধা থাকবে না। দ্বিধা নেই বিহারের পুলিশ-প্রধানেরও, ঘোষণা ছিল যে ডাইনেবাঁয়ে নয়, প্রতিবাদকারীদের একেবারে বুক লক্ষ করেই ছুঁড়তে হবে গুলি। প্রতিবাদের একটি গুলির বদলে পুলিশের দশটি গুলি চাই, এই ছিল ঘোষণা।

স্টুডেণ্টস হলের সভার পর, শিশিরমঞ্চের রবীন্দ্রসভার পর, ঘরে ফিরে এসে মনে হয়, ঠিক, আরওয়াল কোনো একক উদাহরণ নয়। হয়তো এ-উদাহরণ শক্তিই এনে দেবে মানুষকে। এদেশের প্রধান যিনি, তাঁর প্রতিমুহূর্তের স্লোগান হলো : দেশকে নিতে হবে একুশ শতকে। তাঁর ধারণার একুশ শতকে নয়, কিন্তু আরেক একুশ শতকের দিকে হয়তো আমাদের এগিয়ে দেবে আর-ওয়াল। একটি কবিতা লিখেছিলাম পরদিন সকালে।

তারপর কেটে গেছে কয়েকমাস। যতদূর বিক্ষোভে কেঁপে উঠবার কথা ছিল সমস্তটা দেশের, ঠিক ততটাই দেখা যায়নি এর প্রকাশ। আবারও মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা। তাঁকে নিয়ে অতি-প্রগতিপন্থীদের সমালোচনার কথা। আর সময় বয়ে যেতে থাকে।

আগস্ট মাসের এক সন্ধ্যাবেলা, কলেজ থেকে ফিরবার পথে, মনে পড়ল হঠাৎ গীতার প্রথম লাইন। আর তার 'সমবেত' শব্দটা পর্যন্ত পৌঁছেই যেন দেখতে পেলাম এক সমাবেশের ছবি, আরওয়ালের গান্ধীমাঠ। হ্যাঁ, মনে হলো সেও এক ধর্মক্ষেত্র। মনে পড়ল ভূমিসেনা ব্রহ্মর্ষিসেনা লোরিকসেনাদের নাম। মনে হলো, অন্ধ অন্ধ, ইতিহাসকে যে দেখতে পায় না সে তো অন্ধই। গীতার প্রথম শ্লোকের অনুবাদটা পালটে যেতে লাগল ভিতরে ভিতরে। বাড়ি ফিরে এসে, দুদিন ধরে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া গেল নতুন একটা লেখাকে। সবসময়েই তখন মনে মনে ফিরছে এই ধর্মক্ষেত্র, রণক্ষেত্র!

অন্ধবিলাপ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন :

ধর্মক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে সমবেত লোকজনেরা
সবাই মিলে কী করল তা বলো আমায় হে সঞ্জয়

অন্ধ আমি দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে
কাজেই কোথায় কী ঘটছে তা সবই আমায় জানতে হবে

সবই আমায় বুঝতে হবে কার হাতে কোন্ অস্ত্র মজুত
কিংবা কে কোন্ লড়াইখাঁচে আড়াল থেকে ঘাপ্‌টি মারে

অন্ধ আমি, দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে
এবং লোকে বলে এ দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে

কারা এসব রটিয়ে বেড়ায় বলো আমায় হে সঞ্জয়
অন্ধ আমি, কিন্তু তবু এসব আমায় জানতে হবে

তেমন-তেমন তম্বি করলে বাঁচবে না একজনার পিঠও
জানিয়ে দিয়ো খুবই শক্ত বল্লাতে এই রাষ্ট্র ধৃত

অসম্ভবের কুলায় আমার পালক দিয়ে বুলিয়ে যাবে
সেই আশাতে ঘর বাঁধিনি, দুর্যোধনরা তৈরি আছে

এবং যত বৈরী আছে তাদের মগজ চিবিয়ে খাবে

সামান্য এক ছটাক জমি ছাড়বে কেন আমার ছেলে
আমার সঙ্গে ভূমিসেনা আমার সঙ্গে ভূস্বামীরা

আমার সঙ্গে দ্রোণ বা কৃপ আমার সঙ্গে ভীষ্মবিদুর
সেদিক থেকে দেখতে গেলে ধর্মরাজ্য এমন কী দূর

দুষ্টে বলে, মনে মনে তারা আমার কেউ না কি নয়
সেটাও যদি সত্যি হয় তো একাই একশো আমার ছেলে

তারাই জানে শমনদমন, ধ্বংস দিনে ধ্বংস রাতে
ছড়িয়ে যাবে ঘটল যা সব আরওয়ালে কানসারাতে

যে যা করে তাকে তো তার নিশ্চিত ফল ভুগতে হবে
কোথায় যাবে পালিয়ে, দেখো সামনে আমার সৈন্যব্যূহ

তিনদিকে তিন দেয়াল ঘেরা সাতান্ন রাউণ্ড গান্ধীমাঠে
ভিজল মাটি ভিজল মাটি ভিজুক মাটি রক্তপাতে

অধর্ম ? কে ধর্ম মানে ? আমার ধর্ম শত্রুনাশন
নিরস্ত্রকে মারব না তা সবসময় কি মানতে পারি ?

মারব না কি নিভূ'মিকে ? নিরন্নকে ? নিরস্ত্রকে ?
অবশ্য কেউ মেরেছিল সেটাই বা কে প্রমাণ করে !

এখন আমার মনে পড়ে বেদব্যাস যা বলেছিলেন
সৈন্যে শস্ত্র ছুঁড়ছে তা নয়—কোষ থেকে তা আপ্‌নি ছোটে

মাঝেমাঝেই ছুটবে এমন—ব্যাস তো জানেন আমার দশা
এই যে আমার একশো ছেলে—কেউ বশে নয় এরা আমার

এইরকমই অন্ধ আমি, আমিই তবু রাজ্যশিরে
—কিন্তু কারা শপথ নিল নিজেরই হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ?

ধানজমিতে খাসজমিতে সমবেত লোকজনেরা
ধেয়ে আসছে সামন্তদের—কেন এ দুঃস্বপ্ন দেখি ?

পুব থেকে পশ্চিমের থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কে
অক্ষৌহিণী ঘিরবে বলে ফন্দি করে আসছে ঝেঁপে ?

লোহার বর্মে সাজিয়ে রাখি কেউ যেন না জাপটে ধরে
স্বপ্নে তবু এগিয়ে আসে নারাচ ভল্ল খড়্গ তোমর—

এখন আমার মনে পড়ে বেদব্যাস যা বলেছিলেন
নিদেনকালে সমস্তদিক নাশকচিহ্নে ছড়িয়ে যাবে

সন্ধ্যাকাশে দুই পাশে দুই শাদালালের প্রান্ত নিয়ে
কৃষ্ণগ্রীব মেঘ ঘুরবে বিদ্যুদ্দামমণ্ডিত

বাজশকুনে হাড়গিলেতে ভরবে উঁচু গাছের চুড়ো
তাকিয়ে থাকবে লোহার ঠোঁটে খুবলে খাবে মাংস কখন

মেঘ ঝরাবে ধুলো, মেঘেই মাংসকণা ছড়িয়ে যাবে
হাতির পিঠে লাফিয়ে যাবে বেলেহাঁস আর হাজার ফড়িং

কাজেই বলো, হে সঞ্জয়, কোন্ দিকে কার পাল্লা ভারি ?
জিতব ? না কি নিদেনকালের জাঁতায় পিষে মরব এবার

সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধেক কি ছাড়তে হবে ?
টুকরো টুকরো করব কি দেশ পিছিয়ে গিয়ে সগৌরবে ?

যে যাই বলুক এটাই ধ্রুব — আমার দিকেই ভিড়ছে খুব
তবুও শুধু ব্যাস যা বলেন সেটাই কি সব ফলবে তবে ?

ফলুক, তবু শেষ দেখে যাই, ন্যাংটার নেই বাটপাড়ে ভয়
ইঙ্গিতে-বা বলছে লোকে আমার না কি মরণদশা

বাজশকুনে হাড়গিলেতে তাকিয়ে আছে লোহার ঠোঁটে —
ধানজমিতে খাসজমিতে জমছে লোকে কোন্ শপথে

কিসের ধ্বনি জাগায় দূরে দিকে এবং দিগন্তরে
দেবদত্ত পাঞ্চজন্য মণিপুষ্পক পৌণ্ড্র সুঘোষ

শেষের সে রোষ ভয়ংকরী সেই কথাটা বুঝতে পারি
কিন্তু তবু অন্ধ আমি, ব্যাসকে তো তা বলেইছিলাম

বলেছিলাম এটাই গতি, ভবিতব্য এটাই আমার
আমার পাপেই উশকে উঠবে হয়তো-বা সব ক্ষেত বা খামার

উশকে উঠুক উশকে উঠুক মহেশ্বরের প্রলয়পিনাক
সর্বনাশের সীমায় সবাই যায় যদি তো শেষ হয়ে যাক

কোন্ ক্ষেতে বা কোন্ খামারে সমবেত লোকজনেরা
জমছে এসে শস্ত্রপাণি বলো আমায় হে সঞ্জয়

সমবেত লোকজনেরা কোথায় কখন কী করছে তা
শোনাও আমায়, অন্ধ আমি, শোনাও আমায় হে সঞ্জয়

শোনাও আমায় শোনাও আমায় শেষের সেদিন হে সঞ্জয় ।

আত্মতৃপ্তির বাইরে

প্রায় তিরিশ বছর আগে 'কৃত্তিবাস' যখন প্রথম ছাপা হচ্ছিল, তখন তার প্রতিসংখ্যাতেই দুটি-একটি ভাবনাসঞ্চারী গদ্য থাকত। তরুণদের কবিতার পাশাপাশি নতুন দিনের কবিতার সমস্যা নিয়ে লিখতেন তখন বড়োরা, কখনো সমর সেন কখনো জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, আর কখনো-বা শান্তিনিকেতন থেকে সুনীলচন্দ্র সরকার। কবিরা অথবা পাঠকেরা কতদূর মন দিয়ে লক্ষ করছিলেন ছোটো সেই লেখাগুলি, তা আজ বলা শক্ত। কিন্তু সেদিনকার লেখাগুলির মধ্যে ছিল গূঢ় এক ঐক্য, ছিল এমন এক প্রত্যাক্ষণ যা সেই সময়ের ইতিহাসের দিক থেকে বেশ তাৎপর্যময় বলে মনে করা যায়।

ঐক্যটা ছিল এইখানে যে, আধুনিক কবিতা-আন্দোলনের প্রায় পঁচিশ বছর কেটে যাওয়ার পর এঁরা সকলেই তখন ইঙ্গিত করছিলেন এক দিক-পরিবর্তনের, এক মুক্তির, ছোটো-কোনো-গোষ্ঠী থেকে বড়ো-এক-সমাজের দিকে মুক্তি। সমর সেন ভাবছিলেন যে কবিতার ভাষা অনেকটা সহজ হয়ে আসছে তখন, 'যাঁরা আগে আবেগকে ঘষেমেজে লাইন বানাতেন তাঁদেরও আজ বেশি কথা বলবার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট', আর এই ঝোঁকের প্রেরণা হলো সমর সেনের বিচারে—'গোষ্ঠী থেকে সমাজে বেরোবার তাগিদ'। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র চেয়েছিলেন, ফিরে আসুক কবিতা-আবৃত্তির লোকায়ত সম্বোধন, 'ব্যক্তি-চিত্রকল্প থেকে লোক-চিত্রকল্পের' দিকে উত্তরণ ঘটুক বাংলা কবিতার। আত্ম-ব্যাপ্তির আর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবেন কবি, এইটেই হতে পারে নতুন কবিতার পথ—ভাবছিলেন তিনি। আর, প্রায় একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করছিলেন সুনীলচন্দ্র সরকার, বলছিলেন যে কবিরা যদি আজ 'আত্মবিলোপের দ্বারা সোনার ফসল' ফলান তবে সেইটেই কেবল হতে পারে আগামী দিনের স্থায়ী কবিতা। এইভাবে, তিনজনেরই ভাবনার মধ্যে দেখা দিয়েছিল কবিতার সঞ্চারের সমস্যা, পাঠকের দিকে কবিতাকে এগিয়ে নেবার

সমস্যা।

এই এগিয়ে নেবার জন্য কোনো কোনো লক্ষণও কি দেখা যাচ্ছিল তখন? কবি আর পাঠকের সংযোগের জন্য কোনো নতুন সম্ভাবনার পথও কি খোঁজা হচ্ছিল? আমাদের মনে পড়বে যে কলকাতার পথে পথে 'আরো কবিতা পড়ুন'-এর ধ্বনি নিয়ে কবিদের আন্দোলন এরই সমসাময়িক ঘটনা, মনে পড়বে 'কৃত্তিবাস'-এর প্রথম সংখ্যাতে 'কাব্যসভা' নামে একটি প্রতিবেদন লিখছেন তরুণ সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। স্কটিশচার্চ কলেজে সেই সভার প্রথম অধিবেশনটির বিবরণ দিতে গিয়ে সুনীল লিখেছিলেন যে,এই সভা 'আত্ম-কেন্দ্রিক কবিকে চোখ খুলে তাকাতে সাহায্য করবে, সব কবিকেই এই সভা আহ্বান করবে আবৃত্তি আর আলোচনার জন্য।' প্রস্তাবিত কাব্যসভা হয়তো খুব বেশিদূর এগোয়নি আর, কিন্তু এরই অল্প পরে দেখা দিয়েছিল সেনেট হলের দুদিনব্যাপী ঐতিহাসিক সেই কবিসম্মেলন, যে-সম্মেলনের সফলতার পর আজ তিন দশক জুড়ে প্রকাশ্য কাব্যপাঠ আমাদের সংস্কৃতিচর্চার প্রায় এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠল।

তাহলে কি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা সমর সেনরা যা চেয়েছিলেন, সেইটেই ঘটল দিনে-দিনে? গোষ্ঠী থেকে সমাজের দিকে এগিয়ে এল কবিতা? ঘর থেকে পথে? আত্মকেন্দ্রিকতার বদলে ঘটতে পারল আত্মবিস্তার?

এই প্রশ্নের উত্তরে পৌঁছবার আগে একটা কথা ভাববার আছে। জনমুখী এবং রাজনৈতিক কবিতার একটা ধারা ততদিনে প্রচলিত হয়ে গেছে সুকান্ত ভট্টাচার্য বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনার মধ্য দিয়ে, অথবা এঁদের অনুসারী কারো রচনায়। কিন্তু আরো কবিতা পড়ার স্লোগান নিয়ে যারা পথে নেমে-ছিলেন সেদিন, তাঁরা এঁরা নন। তাঁরা ছিলেন নরেশ গুহ অথবা অরুণকুমার সরকারের মতো কবিরা, কবিতাকে যাঁরা সহজ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু যাঁদের কবিতার ভিত্তি ছিল একেবারেই ব্যক্তিগত ছোটো একটা জগৎ। সামাজিকতা বা রাজনৈতিকতাকে কবিতার পক্ষে ধিক্‌কারযোগ্য ভেবে এঁরা তখন তৈরি করতে চেয়েছিলেন এক নিভৃত শুদ্ধতা। আর, এর সঙ্গে সঙ্গে, 'কৃত্তিবাস' বা 'শতভিষা'র মতো পত্রিকাগুলির প্রধান সঞ্চয় ভরে উঠছিল আত্মকেন্দ্রিকতারই নির্মাণে। যে 'আত্মপ্রসাদ' বা 'আত্মকেন্দ্রিকতা'র সংকটের

কথা বলা হয়েছিল পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়, অল্পদিনের মধ্যে সেইদিকেই উদ্‌গত হয়ে উঠল এর প্রবণতা। আবার নতুন করে দেখা দিল ভাষার তির্যক চাল, প্রকাশগত সংহতির ভাবনা, কখনো-বা ইঙ্গিত এবং রহস্যের প্রতি কবিদের নতুন আকর্ষণ।

সেটা ভালো ছিল কি মন্দ ছিল, সে-কথা আপাতত তুলছি না। কিন্তু যে-কথাটা ভাবতে হবে তা হলো, নতুন এই কবিতার সঙ্গে পাঠকের ঠিক কীরকম সম্পর্ক প্রত্যাশিত। কবিতা-আবৃত্তির কথা এতটা যে জোর দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তার কারণ বা প্রেরণা তো কোনো এক সংযোগের ভাবনায়? তিনি ভেবেছিলেন, নতুনভাবে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য কবিকে আজ 'আলংকারিক দিকগুলিকে বর্জন করে কাব্যে অঙ্গীকৃত করতে হবে অপেক্ষাকৃত সহজ ও direct আবেদনের বর্ণাঢ্য ভাষা'। কেবল তিনিই ভেবেছিলেন তা নয়, কথাটা এই যে জনসমাজে প্রত্যক্ষ আবৃত্তিযোগ্য কবিতার একটি নিজস্ব চরিত্র থাকবার কথা, এইটে হবার কথা যে সেখানে থাকবে এক বহির্মুখিতা বা বাগ্মিতা বা উচ্চরোল কোনো প্রবণতা। যে-কবিতা একেবারে তার বিরুদ্ধ-রীতির, সেও কি সহজে জনসমাবেশে বহুকবি-পরম্পরায় আবৃত্তিযোগ্য হতে পারে, পৌঁছে দিতে পারে তার ভিতরকার সার? যে-কবিতা ধ্যানের, গূঢ়তার, অন্তর্ভেদের—সেও কি হতে পারে 'আরো কবিতা পড়ুন' আহ্বানের অনায়াস উপাদান?

অথচ, হয়ে দাঁড়াল তাই। ফলে এই একটা প্যারাডক্স তৈরি হলো যে কবিতার চরিত্রকে না পালটে পালটানো হলো কেবল পাঠকের সঙ্গে তার যোগাযোগের ধরন। পাঠকের কাছ থেকে অসংগতরকম দূরে সরে যাচ্ছে কবিতা, এই ভাবনাটা নিশ্চয় ছিল কবিদের মনে। কিন্তু এ ভাবনা থেকে তাঁরা যে নিজেদেরই পালটালেন এমন নয়, কবিতা বিষয়ে তাঁদের বোধের যে বদল হলো এমন নয়, বদল হলো কেবল প্রচারপদ্ধতির। মুদ্রিত শব্দ বন্দী হয়ে থাকে দুই মলাটের মাঝখানে, তাকে খুলে দেখবার কোনো উৎসাহ পান না পাঠক, তাই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত সেই শব্দকে কবি পৌঁছে দেবেন সমাজে। তাই কবিসম্মেলন। কিন্তু, যে-কবিতা একবার দুবার তিনবার পড়বার, যে-কবিতা চকিত স্ফুরণের অথবা প্রবল প্রপাতের মধ্য দিয়ে ধরতে

চায় পাঠকের গাঢ়তম অন্তস্তলকে, যে-কবিতা পড়বার পরেও অনেক সময়ে দুর্গম বা ধ্যানগম্য থেকে যায় পাঠকের কাছে, জনসভায় উচ্চারণমাত্রেই তার সভাসফল হবার কথা নয়। তবু, যে-কবিতা সভার নয়, সে-কবিতা সভায় গিয়ে দাঁড়াল। আর এরই ফলে একটু একটু করে তৈরি হয়ে উঠল প্রচ্ছন্ন এক বিরোধ। শ্রোতাদের দিক থেকে কবিতার ভাষায় লক্ষণীয় হতে লাগল কিছু চটক, কিছু নাটকীয়তা, কিছু-বা সাংবাদিকতা। কবিতার চেয়ে কবিতার কিংবদন্তি হয়ে উঠল বড়ো। কবিতা হয়ে উঠতে চাইল ভুল অর্থে সামাজিক।

কবিতার এই ভুল সামাজিক ভূমিকায় আরো একটা সমকালীন ঘটনা গণ্য করতে হবে। পঞ্চাশের সূচনাকাল পর্যন্ত এটা আমরা দেখেছি, কবিতা-পাঠকেরা উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করতেন কয়েকটি পত্রিকার জন্য, 'কবিতা' বা 'পরিচয়', 'পূর্বাশা' বা 'সাহিত্যপত্র', 'অগ্রণী' বা 'ক্রান্তি'র মতো স্বল্পপ্রচার পত্রিকা। কবিদের প্রধান আশ্রয় ছিল এইসব পত্রিকা, এসব পত্রিকায় লিখতে পারলেই সেদিন খুশি হতেন তরুণ কবিরা, পাঠকেরাও জানতেন যে এইখান থেকেই ছোঁয়া যাবে আধুনিক কবিতার ধমনী। কিন্তু এসব পত্রিকার কোনো-কোনোটি লুপ্ত হয়ে গেছে পঞ্চাশের শেষভাগে পৌঁছে, কোনোটি-বা অবসন্ন হয়ে আসছে, কোনোটির প্রকাশ অনিয়মিত। অন্যদিকে 'দেশ'-এর মতো সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রসার বাড়ছে ঠিক এই সময়ে, পঞ্চাশ থেকে তার তিনগুণ মুদ্রণ বেড়েছে ষাটে, সত্তরে প্রায় সাতগুণ। এই প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাকেও নানা প্রতিপত্তি দিতে শুরু করছে এইসব পত্রিকা, এ-ধরনের আরো অনেক। অল্পে অল্পে এখন কেবল দৈনিকতা বা সাপ্তাহিকতার বা পাক্ষিকতার ওপর ভর করেই তৈরি হয়ে উঠল নতুন এক পাঠকদল, ঔৎসুক্যহীন প্রস্তুতিহীন দ্রুতমনস্ক যে পাঠক দুটি-একটি মুদ্রিত লেখা দেখে বলে দিতে পারেন যে আধুনিক কবিতা 'কিছু বোঝা যায় না' অথবা তা 'ভারি চমৎকার'! পাঠকের এই সংখ্যা সম্প্রসারণকে বলা যায় কবিতাবিষয়ক মন্তব্যের সম্প্রসারণ মাত্র, এ ঠিক কবিতাবিষয়ক বোধের কোনো প্রসার নয়। সমর সেন তাঁর 'কৃত্তিবাস'-এর লেখাটিতে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে সমাজমুখী হবার পথে নতুন দিনের কবিতার একটা ভয়েরও দিক আছে। বাগাড়ম্বরের দিকে এগিয়ে যেতে পারে কবিতা, দেখা দিতে পারে ভাবালুতা, কবিরা ভুলে যেতে পারেন যে বুদ্ধি আর

আবেগের সমন্বয়েই কবিতার উৎস—মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি এসব কথা। পরিপার্শ্বের কারণে, কবিতার প্রকাশ আর প্রচারের অন্তর্গত এই বিরোধের কারণে, অংশত সত্য হয়ে দাঁড়াল এই আশঙ্কা। কবিতার ইতিহাসে নতুন একটা ভাবনার দিক দেখা দিল এই যে, ভাবালু এক আড়ম্বরে বা সাংবাদিক এক মিথ্যায় ভারাক্রান্ত হতে চাইল কাব্যভাষার বেশ বড়ো একটা অংশ।

২

এক হিসেবে, এ-সংকটটা কেবল আমাদের দেশেরই নয়, এটা আমাদের সময়েরই এক সংকট। যে কোনো সত্য উচ্চারণকে মিথ্যা আড়ম্বরের দিকে টেনে নিতে এখন আর সময় লাগে না বেশি, যে-কোনো বোধ বা উপলব্ধি মুহূর্তমধ্যে হয়ে উঠতে পারে নিছক পণ্য মাত্র। শব্দ বা ভাষার ব্যবহার তাই আমাদের কাছে ভয় নিয়ে আসে অনেক সময়ে, লেখকেরা নিজেরাও অনেক সময়ে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন তাঁদের ভাষা ব্যবহারের সম্ভাবনা বিষয়ে। লেখা থামিয়ে দেবার কথাও হয়তো তখন ভাবেন কেউ কেউ।

যিনি থামিয়ে দেন, তাঁর আর কোনো সমস্যা নেই অবশ্য। কিন্তু প্রতি-রোধের এই জটিলতা আছে বলে সকলে যে থামিয়েই দেবেন তাঁদের সৃষ্টি, এমন কোনো কথা নেই। বরং তখন সচেতন শিল্পীর সামনে এসে পৌঁছয় নতুন ধরনের একটা লড়াই, ভাষাকে ভেঙে দিয়ে ভাষার সত্যে পৌঁছবার কোনো লড়াই। এরই একটা ছবি ধরতে পাই যখন *Nova Express*-এর মধ্যে বারোজ দেখিয়েছিলেন যে নীরবতাই হলো আমাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষণীয় অবস্থা, কিন্তু শব্দেরই কোনো বিশেষ প্রয়োগরীতির মধ্য দিয়ে আমরা পৌঁছতে পারি সেই নীরবতায়। নিশ্চয় এই রীতির খোঁজেই তাঁকে ভাঙতে হয়েছিল শব্দ অথবা প্রতিমার অভ্যস্ত পারম্পর্য, ধরতে হয়েছিল তাঁর কাট্-আপ পদ্ধতি। কিংবা, এরই একটা ধরন দেখি যখন গিন্সবার্গ ভাবেন যে তাঁর কবিতার ছন্দ উঠে আসবে একেবারে তার শরীরের অন্তস্তল থেকে, নিশ্বাস থেকে, ফুসফুস থেকে—নিছক মনেরই কোনো সৃষ্টি নয় সেটা। অথবা ধরা যাক, একেবারে অন্য দেশের অন্য এক প্রকৃতির কবি ইয়র্গে গিয়েন এরই প্রতিক্রিয়ায় এমন

কোনো ভাষা খুঁজে নিতে চান যা শব্দকে অতিক্রম করে আমাদের পৌঁছে দেবে কোনো শব্দাতীত তাৎপর্যের দিকে।

এই কুড়ি বছর বাংলা কবিতাতেও এসবেরই বিক্ষিপ্ত এবং মরিয়া ব্যবহার আমরা দেখেছি অনেক সময়। সমসাময়িক স্থূলতা অথবা বাজারের পণ্যতা আমাদের সত্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়, এই ভয়ের সামনে দাঁড়িয়ে জীবন থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন কেউ কেউ, ভাষাকে নিয়ে যেতে চাইলেন স্পর্শযোগ্য বাস্তবতার একেবারে বাইরে। প্রতিস্পর্ধী আর অলীক এক দ্বিতীয় ভুবন গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখলেন কেউ, স্বতঃস্ফূর্ত আর অনর্গল প্রতিমাপুঞ্জের মধ্য দিয়ে রহস্যাতুর পরাবাস্তবতার স্বপ্ন দেখলেন কেউ-বা, কেউ-বা ভাষার জৌলুশ ঝরিয়ে দেবার আয়োজনে তাকে রিক্ত করে নিয়ে এলেন যতদূর সম্ভব। আর কখনো-বা ঝাঁপিয়ে পড়া হলো ভাষার ওপর সর্বাত্মকভাবে, তছনছ করে ভেঙে ফেলে তার মধ্য দিয়ে ধরতে চাওয়া হলো সমসাময়িক অথচ গূঢ়তর এক বাস্তবতারই চরিত্র।

এটা ঠিক নয় যে চারদিকের সমূহ সর্বনাশ বিষয়ে কোনো চেতনাই ছিল না এই কুড়ি বছরের কবিতায়। এক-একটা সময়ে তরুণ এক কবিদলের আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গে এইসব ভয়াবহতার সঙ্গেই পরিচিত হয়েছেন তাঁরা, এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরনে যুদ্ধ করতে চেয়েছেন এই ভয়ংকরের বিরুদ্ধে। কিন্তু এও ঠিক যে অবিন্যস্ত অসম্পূর্ণ আর দ্বিধান্বিত ভাবে এসব যুদ্ধ নষ্ট হয়ে গেছে প্রায়ই, ভেঙে গেছে হয়তো মধ্যপথে। তাই কবিতার কোনো সর্বগ্রাসী বিরাট আয়োজন আমাদের চোখের সামনে আজ দেখতে পাই কম।[১] সাময়িকের মধ্য দিয়েই অতিসাময়িক হয়ে উঠবে যে কবিতা, বোধ আর বুদ্ধির সামগ্রিকতায় গড়ে উঠবে যে কবিতা, ইতিহাসকে সত্তার মধ্যে ধারণ করবার অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে উঠবে যে কবিতা, সে-কবিতার যোগ্য ভাষা এখন আর আমাদের আয়ত্তে নেই মনে হয়। জীবনানন্দ অনেকদিন আগে ভেবেছিলেন যে কেবল খণ্ড কবিতা নিয়ে তৃপ্ত থাকবে না ভবিষ্যৎ, শ্লেষে আর নাটকীয়তায় আর দীর্ঘ-

১. আমিও কিছুদিন কবিতা লিখেছি বলে এখানে এটা বলা দরকার যে, যেসব দ্বিধাচ্ছিন্নতা বা অসম্পূর্ণতা বা সীমাবদ্ধতার কথা বলা হচ্ছে এ লেখায়, আমি নিজেও তার এক ধারাবাহিক শিকার।

তার হয়তো বৈচিত্র্য আসবে অনতিদূর বাংলা কবিতার ইতিহাসে! দু-চারটি দীর্ঘ কবিতার সাম্প্রতিক প্রকাশ সত্ত্বেও মনে হয় না যে আমাদের ইতিহাসে সত্য হয়ে উঠছে জীবনানন্দের সেই ধারণা। কেননা, মনে রাখতে হবে, খণ্ডতা বা দীর্ঘতা এখানে কোনো পরিমাণসূচক প্রভেদমাত্র নয়, জীবনানন্দ নিশ্চয় ভাবছিলেন কোনো এক চারিত্রিক পরিবর্তনের কথা। এমন কোনো কবিতার কথা ভাবছিলেন তিনি যা আমাদের 'নতুন, জটিল সময়ের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রী'কে ধারণ করতে পারে, পেতে পারে প্রায় যেন এক শেক্সপীয়রীয় বিস্তার।

জীবনানন্দের নিজের কবিতার ইতিহাসে অভিজ্ঞতাকে এই সমগ্রতার দিকে নিয়ে যাবার পথচিহ্নগুলি থেকে গেছে। অস্তিত্বের অবতল থেকে উদ্‌গত হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতা, কিন্তু উদ্‌গত হয়ে উঠেছে কেবল এক ইতিহাসযানের দিকে, সভ্যতাহীন এক সভ্যতার পরিপার্শ্বে। 'মহাপৃথিবী' থেকে 'সাতটি তারার তিমির', 'সাতটি তারার তিমির' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে আমরা দেখতে পাব কীভাবে একজন কবি সমকালীন সমাজের সমস্ত ক্লেদ এবং আকাঙ্ক্ষাকে, স্খলন এবং উত্থানকে, ভয় এবং ভালোবাসাকে একই সঙ্গে ধারণ করতে পারেন তাঁর মজ্জার মধ্যে; কীভাবে অবচেতনের অতল থেকে উঠে আসতে পারেন অধিচেতনায়। 'বহমান ইতিহাস মরুকণিকায়' পিপাসা মেটাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে আমাদের, আমরা বুঝতে পারছি যে 'সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে / তা তো নেই;—স্থবিরতা আছে—জরা আছে', কিন্তু তবু আমরা বলতে পারি 'অন্ধকারে সবচেয়ে সে-শরণ ভালো: / যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো।' এইরকমই বলেছিলেন জীবনানন্দ। কিন্তু এতদূর বলেও, এ-কবির হয়তো মনে হয়েছিল কোনো অসম্পূর্ণতার কথা। যে আধুনিকতা তার মর্মের মধ্যে 'অনেক বড়ো সময়সাপেক্ষ ইতিহাস'কে ধরতে চায়, নিজের পরিণতির মধ্যেও হয়তো তাকে যথেষ্ট বলে ভাবেননি জীবনানন্দ।

কিন্তু যতদূর তিনি পেরেছিলেন, বাংলা কবিতা কি সেই পটভূমিটুকুও আজ হারিয়ে ফেলছে না? জীবনানন্দের অনুরাগীতে কবিতার জগৎ আচ্ছন্ন

আজ, কিন্তু জীবনানন্দের যথার্থ কোনো ঐতিহ্য পরে আর সে বইতে পারল কি না সন্দেহ। সে-ঐতিহ্য এলোমেলো হয়ে গেল কখনো স্বপ্নাবিষ্টতায়, কখনো তুচ্ছ সাময়িকতায়, কখনো কেবল শব্দঝোঁকে। যে অর্থে একদিন সময়ের দিকে এগোতে চেয়েছিল কবিতা, দার্শনিক সময় থেকে ঐতিহাসিক সময় পর্যন্ত একমুঠোয় ধরতে চেয়েছিল যেভাবে, তার চিহ্ন যেন সরে যাচ্ছে আমাদের চর্চা থেকে। কেননা দিনে দিনে আমাদের ঘিরে ধরছে একটা ভুল সামাজিকতা, একটা ছোটো সামাজিকতা, আমাদের চারপাশে উদ্যত হয়ে উঠছে অনেক নিরর্থক প্রকাশ্যতা, অনেক বিজ্ঞাপন আর প্রচার, গত একদশক জুড়ে আমাদের চারপাশে দেখতে পাচ্ছি বিপুল এক ম্যাগাজিন-এক্সপ্লোশন, তীব্র এক মিডিয়া-এক্সপোজারের যুগ। যে-উদাসীনতা, যে-নীরবতার মধ্য দিয়ে শিল্পের নেপথ্য ক্রমশ এগিয়ে আসতে পারত জীবনযাপনের দিকে, চারদিক থেকে তা দ্রুত ভেঙে পড়ছে বলেই কবি আজ আরো বেশি দিশেহারা হয়ে আছেন, অথবা কখনো-বা আত্মতৃপ্ত। এই একটা সময়, যখন কবিতার জগৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুখী আর ছোটো, যখন বড়ো কোনো আত্মবিস্তারের দিকে এগিয়ে যেতে ভুলে যাচ্ছি আমরা। এই একটা সময়, যখন আরো বেশি ব্যক্তিগত সাহসের দরকার হলো কবির, আরো বেশি ব্যক্তিগত আড়াল থেকে তাকে আজ ধরতে হবে আমাদের মহাসময়ের জটকে, আত্মবিলোপে নয়, সর্বস্বজোড়া আত্মোদ্ঘাটনে। সেইটেই হয়তো হতে পারে আমাদের আজকের দিনের কবিতার নতুন কোনো উত্তরণ। কিন্তু, এখনো আমরা জানি না, কোথায় অথবা কার কাছে আছে তার যোগ্য কোনো ভাষা, সমস্তের মধ্যে তার যোগ্য কোনো সমর্পণ।

প্রবাহিত মনুষ্যত্ব

ভুবনেশ্বরী

ভুবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে
একে একে তার রূপের অলংকার
খুলে ফেলে, আর গভীর রাত্রি নামে
তিন ভুবনকে ঢেকে ;

সে সময়ে আমি একলা দাঁড়িয়ে জলে
দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ, যায়
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল নিরুদ্দেশে
দেখি আর ঘুম পায়।

দিন কেটে গেছে কাজের ভারে, নানা কাজ নানা জনের মাঝখানে, একটু একটু করে সন্ধ্যা হয়ে এল, অবসাদ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি মুক্ত আকাশের নিচে নিঃশব্দ নির্জনে, চারদিকে খোলা পড়ে আছে পৃথিবী। শুধু আমি আর এই পৃথিবী, এই মুহূর্তে যেন আর কেউ কোথাও নেই, মুখোমুখি শুধু দাঁড়িয়ে থাকা আর দেখা, আর অল্প থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে ভারি ভারি অন্ধকারে মুছে যাওয়া সব, সব দৃশ্য, সব পরিবেশ। একাকার হয়ে আসে আকাশ আর মাটি আর জল, রূপে রূপে আর কিছু আলাদা হয়ে নেই এখন, আমি শুধু দেখি, দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু দেখিও কি? সমস্ত শরীরের অবসাদ নেমে আসে চোখে, চোখের সামনে এসে দুলে যায় যেন কোনো তন্দ্রার হালকা পর্দা, তারই সেই স্বচ্ছ বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে দেখি সমস্ত অন্ধকার যেন হয়ে আছে জল, যেন সেই সচল জলপ্রবাহে ভেসে চলেছে সমস্ত পৃথিবী, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, আর আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই জলে। ঘুমে ভরে আসে চোখ, সরে যায় সচেতন মনের চাপ, সরে যায় যুক্তির বুদ্ধির শৃঙ্খলার ভার, বোধের মধ্যে

অনুভব করি এক ভাসমান মুক্তি, চারপাশের শূন্য এসে শরীরকে ছুঁয়ে থাকে তার সজলতা নিয়ে, সত্য হয়ে ওঠে পৃথিবীর ভিতরকার আরেকটা পৃথিবী, সেই আমার গভীরতম সত্যরূপের ভুবনেশ্বরী, প্রত্যক্ষ আর সচেতন সব রূপের আভরণ থেকে নিজেকে তখন সরিয়ে নিয়েছে সে, তার আর আমারও চেতনার মধ্যে নেমে এসেছে গভীর শান্তির রাত্রি। অনুভব করি এখন মহাসৃষ্টিপ্রবাহকে, ভেসে যায় ভেসে চলে যায় সৌরজগৎ অনির্দেশ্য শূন্যতায়, দেখি, দেখি আর ঘুম পায়।

এমনি এক ঘুমের এই কবিতা, এক অবচেতনের, যে অবচেতন থেকে জেগে ওঠে প্রবহমান মহাসৃষ্টির সঙ্গে নিজের লীনতার মুহূর্তজাত এক প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা। অবিস্মরণীয় এক কবিতার মুহূর্ত। অন্ধকারের এই জলছবি যে বাংলা কবিতায় একেবারে নতুন তা নয়, 'চঞ্চলা' কবিতার 'অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল' থেকে শুরু করে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজেরই স্বয়ম্পূর্ণ এক কবিতা 'অন্ধকারে দেখা যায় না/তবু/অনুভব করা যায় চোখের জলের নদী প্রবাহিত/এইখানে' পর্যন্ত তো পড়েছি আমরা। কিন্তু চেতনা থেকে অবচেতনের, রূপারতি থেকে লীনরূপতার, একাকী থেকে মহাসৃষ্টির মুখোমুখি হবার মতো এমন ঘনতাময় কবিতার অভিজ্ঞতা বড়ো সহজে মেলে না।

২

প্রবাহিত মনুষ্যত্ব

আর অন্যদিকে, একজন বর্ষীয়সী মহিলাকে জানি, 'মানুষখেকো বাঘেরা বড়ো লাফায়' বইটি পড়ে এর কবিকে যিনি একটি চিঠি লিখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলেন। এর তাপ আর বিক্ষোভ, এর প্রাত্যহিকতা আর পথচারিতার খুব সহজেই নিজের মন মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন সেই মহিলা। বাংলা কবিতার প্রেমিক একজন বিদেশি মানুষকেও জানি, কলকাতায় এসে যিনি কবিতার মধ্যে খুঁজছিলেন এদেশের সাময়িকতার চাপ, এর প্রতিদিনের রক্তক্ষরণ। আমাদের মতো দেশে কিংবা লাতিন আমেরিকায় বা আফ্রিকায় যে-ধরনের প্রতিবাদের কবিতা বিদীর্ণ হয়ে উঠবার কথা এখন, তিনি খুঁজ-

ছিলেন সেইটে। আর এই কাজে প্রচুর সন্ধানের পর তিনি নির্বাচন করে নিয়েছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা—সমস্তরকম লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে আর্ত-নাদ যেমন লাভাস্রোতে বেরিয়ে আসে ওঁর রচনায়, সেটা মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। প্রতিবাদের এই প্রত্যক্ষতাতেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষতম কবিতার পরিচয়, এইখানেই তাঁর কবিতার সঙ্গে একাত্মবোধ করেন তাঁর আজকের দিনের পাঠক।

কিন্তু আমরা, যাঁরা অনেকদিন ধরে তাঁর কবিতা পড়ছি, আমাদের তখন অন্য একটা ভাবনাও এসে পড়ে মনে। অনেকদিন আগে যখন তিনি জেগে উঠেছিলেন যেন জীবনানন্দের ভূমি থেকে, তার চেয়ে এখনকার জগৎ কি ততো সরে এসেছে একেবারে? 'পূর্বাশা'র পৃষ্ঠায় যখন তিনি লিখছিলেন 'ক্লান্তি ক্লান্তি'র মতো কবিতা, 'এমন ঘুমের মতো নেশা' কিংবা 'এমন মৃত্যুর মতো মিতা'কে এড়িয়ে জীবন চান না বলে জানাচ্ছিলেন যখন, একাধিক কবিতায় যিনি দেখছিলেন 'শরবতের মতো সেই স্তন'; তাঁর কবিতায় তখন সদর্থেই একটা প্রচ্ছন্ন আবহ ছিল জীবনানন্দের। এটা হতেই পারে যে আজ দীর্ঘ পচিশ বছরের অভ্যাসে তিনি অল্পে অল্পে—কিংবা হঠাৎই একদিন—একেবারে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন সেই আবহ থেকে, মৃত্যুর থেকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন ক্ষুধার্ত জীবনের দিকে। এটা হতেই পারে যে তাঁর কবিতা এখন আর আলো-ছায়ার কোনো প্রদোষ রাখবে না কবিতায়, হয়ে উঠবে স্পষ্ট এবং রূঢ়, সাময়িক-তার প্রয়োজনে অত্যন্ত নির্মমরূপে বাস্তবিক—ঘোষিত এবং দলীয়।

তবু, এইটেই কি তাঁর সব পরিচয়? বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা লক্ষ করে পড়লে দেখা যাবে যে তাঁর এই মুহূর্তেরও রচনায় বিষাক্ত ধিক্কারের সঙ্গেসঙ্গে রয়ে গেছে এক প্রগাঢ় কোমলতা। এই অর্থে, মনে হয়, তাঁর অতীত তাঁকে ছেড়ে যায়নি পুরো, বরং কবিতায় ভিতরকার পর্দায় সেটা এক মস্ত সামর্থ্য এনে দিচ্ছে। প্রথম যৌবনে যে স্বপ্নমদির জগৎ তিনি দেখছিলেন তা আর প্রত্যক্ষে এখন কথা বলে না সত্যি, কিন্তু দেশে দেশে কালে কালে 'প্রবাহিত মনুষ্যত্বে'র প্রতি তাঁর অটুট ভালোবাসা একটা মমতাময় ধমনী রেখে দেয় তাঁর কবিতার অন্তরালে। তখন, এ-রকমই অভিমান আর ক্রোধে মিশে গিয়ে তৈরি হয়ে ওঠে তাঁর ছোটো এক-একটি কবিতা:

নাচো হার্লেমের কন্যা, নরকের উর্বশী আমার
বিস্ফারিত স্তনচূড়া, নগ্ন উরু, স্খলিতবসনা
মাতলামোর সভা আনো, চারদিকের নিরানন্দ হতাশায়,
হীন অপমানে
নাচো ঘৃণ্য নিগ্রো নাম মুছে দিতে : মাতলামোর জাত নেই,
পৃথিবীর সব বেশ্যা সমান রূপসী !
নাচো রে রঙ্গিলা, রক্তে এক করতে স্বর্গ ও হার্লেম।

যেমন আমাদের অভিজ্ঞতারও আছে দিন আর রাত্রি, যেমন দিনের অনেক রৌরব আমরা মুছে নিই রাত্রিবেলার নির্জন আত্মক্ষালনে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিণত কবিতাতেও তেমনি আমরা দেখতে পাব সেই দুই ছায়াপাত। সামাজিক যে-কোনো ঢেউয়ের আঘাতে কেঁপে ওঠেন এই কবি, বিবেচনার কোনো সময় পাবার আগেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েন স্রোতে, ভেঙে ফেলতে চান সব ; ব্যক্তি, সমাজ, প্রতিষ্ঠান—কারোই মুক্তি নেই তাঁর সর্বনাশা রোষ থেকে। কিন্তু এইসব ভয়ংকর মুহূর্তেও তিনি হঠাৎ এক-একবার এসে দাঁড়াতে পারেন সেই ঘুমন্ত সীমায় :

ভুবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে
একে একে তার রূপের অলংকার
খুলে ফেলে, আর গভীর রাত্রি নামে
তিন ভুবনকে ঢেকে ;

এই হলো তাঁর কবিতার রাত্রি, এইটেই তাঁর কবিতার আত্মস্থ অবকাশ, এইখানে তাঁর কবিতার পলিমাটি। এই পলি আছে বলেই তার উপর জেগে-ওঠা সমস্ত দিনের শস্য একটা স্বতন্ত্র আলো পেয়ে যায়, হয়ে ওঠে সমকালীন অন্যান্য চিৎকৃত বিক্ষোভের চেয়ে অনেক স্বতন্ত্র। তাঁরও আছে চিৎকার, কিন্তু অনায়াস সত্য থেকে উঠে আসে বলে তাঁর সেই চিৎকারে প্রায়ই লিপ্ত থাকে একটা মন্ত্রের স্বাদ :

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা ;
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।
অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা।

অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওংকার
সে অন্নে যে বিষ দেয়, কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।

এই কবিতা একটা সমগ্র ক্ষুৎকাতর যুগের জাতীয় স্লোগান হয়ে উঠবার যোগ্য।

এটা ঠিক যে এই কবিতাটিতে, কিংবা এ-পর্যন্ত উদ্ধৃত তিনটি রচনাতেই তাঁর শিল্পসুমিতির যে ধরন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষ পর্যায়ের কবিতার সেইটেই সাধারণ লক্ষণ নয়। তাঁর কবিতা অসমান, অনেক সময়েই তাঁর কবিতা বরং তুলে নিয়ে আসে ঈষৎ ভাঙা চলন, যার ছন্দে ছবিতে শব্দের ব্যবহারে হঠাৎ কখনো মনে হতে পারে যে অশুদ্ধ হলো সুর। কিন্তু সেইটেই যেন তাঁর আনন্দ, যেন কিউবার কবি নিকোলাস গিয়েন-এর মতো তিনিও আজ বলে উঠতে পারেন : নিজেকে অশুচি বলেই ঘোষণা করছি আমি। এই কবিও একদিন 'নিজের মধ্যে নিহিত থেকে অর্কেস্ট্রা বাজানো'র ভঙ্গি জানছিলেন, যুক্ত ছিলেন তাঁর ভাষার মডার্নিজ্‌ম্‌-এর আন্দোলনে ; আর তার থেকে আজ বেরিয়ে এসে এখন তিনি চার পাশে দেখতে পান এক বিশাল চিড়িয়াখানা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও আজ তাঁর ছোটো ছোটো বইগুলির মধ্য দিয়ে তুলে ধরছেন আমাদের আক্রমণকারী সমকালীন ভণ্ড পৃথিবী, আর তাই, 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে' বা 'বাহবা সময় তোর সার্কাসের খেলা' এইসব হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা-বইয়ের নাম। এর অন্তর্গত কবিতাগুলি পড়তে পড়তে কোনো পাঠকের মনে হতে পারে যেন তিনি হেঁটে চলেছেন ধান-কেটে-নেওয়া কোনো জমির ওপর দিয়ে, থেকে-থেকে কাঁটা বেঁধে পায়ে, পিঠে এসে লাগে রোদ্দুরের ফলা ; সেখানে নেই কোনো সমতল মসৃণতা বা শিল্পসুষমার কোনো সচেতন আয়োজন। এর অন্তর্গত কবিতাগুলি পড়তে পড়তে পাঠক কেবলই ঘূর্ণির মতো ঘুরতে থাকবেন এই পাঁচ-দশ বছরের কলকাতার গ্লানিময় ইতিবৃত্তে, সমস্ত ভারতবর্ষের নিরন্তন পচন-লাঞ্ছনায়। আর সেই পটভূমি মনে রাখলে এই অসমান উষর আঘাতময় শিল্পধরনকে মনে হয় অনিবার্য, অনিবার্য মনে হয় এর আপাতশিল্পহীনতা। আপাত, কিন্তু সম্পূর্ণত নয় ; কেননা অনেকদিনের কাব্যমমতাকে যিনি রেখে দিয়েছেন তাঁর

ভিতরে, আজ এই স্পষ্ট ভৎ´সনার উচ্চারণের সময়েও তাঁর ভাষা হয়ে ওঠে এ-রকম : 'আকাশের দিকে আমি উলটো করে ছুঁড়ে দিই কাঁচের গেলাস' অথবা 'ব্রাহ্মমুহূর্তে কারা ছায়ার মতো ছেড়ে গেছে ঘর' কিংবা 'কলকাতার ফুটপাথে রাত কাটায় এক লক্ষ উন্মাদ হ্যামলেট/তাদের জননী জন্মভূমি এক উলঙ্গ পশুর সঙ্গে করে সহবাস' আর 'আমাদের সন্তানের মুণ্ডহীন ধড়গুলি তোমার কল্যাণে ঘোর লোহিত পাহাড় !' তখন বুঝতে পারি কবির যোগ্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁর ভিতরে কাজ করে যায় কীরকম সন্তর্পণে, বুঝতে পারি কোথায় আছে পুরোনো সেই কবির সঙ্গে আজকের কবির নিবিড় কোনো যোগ।

৩

আগুন হাতে প্রেমের গান

কোনো কবি বলতে পারেন কবিতা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো কাজ নেই, কেননা অন্য কোনো কাজ তাঁর যোগ্য নয়। সে হলো একরকমের শিল্পাদর্শ। ভিন্ন আরেক শিল্পাদর্শে বলা সম্ভব, বলতে পারেন কোনো কবি, কবিতা ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজ নেই, কেননা অন্য কোনো কাজের তিনি যোগ্য নন। এই শিল্পাদর্শে কবির কবিতা হয়ে উঠতে পারে কাজের প্রতি, জীবনের প্রতি তাঁর সম্মাননা, তাঁর ভালোবাসা। কেননা কাজেরই একটা বিকল্প হিসেবে তিনি নিয়েছিলেন কবিতাকে।

অসুস্থ হয়ে পড়বার অল্প কয়েকমাস আগে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরোয়া এক সমাবেশে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈষৎ লঘু ভঙ্গিতে ওইরকমেরই একটা কথা বলেছিলেন তাঁর শ্রোতাদের, বলেছিলেন : 'আর কোনো কাজ পারি না বলেই কবিতা লিখি। অন্য কিছু পারলে কি আর লিখতাম ?' তাঁর কবিতা যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে কথাটা অবশ্য নতুন নয়। কবিতারই মধ্যে তো লিখেছিলেন তিনি : 'ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে / যদি আমি সমস্ত জীবন ধরে / একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম / একটি গাছ জন্মাতে পারতাম !' (মহাদেবের দুয়ার)। কেননা, তাঁর অন্তিম দিনগুলির একটি কবিতায় যেমন আছে, 'সবচেয়ে জরুরি হলে শস্য'।

কিন্তু এই কবি নিশ্চয় জানতেন যে তাঁর 'ছত্রিশ হাজার লাইন'ও জাগিয়ে তুলছিল আরেকরকমের শস্য, সেও ছিল এক ভিন্নধরনের বপন। মানুষকে জীবনকে পৃথিবীকে ভালোবাসবার যে-আবেগ তিনি তৈরি করে দিতে পেরেছিলেন তাঁর পাঠকের মনে, এনে দিতে পেরেছিলেন প্রতিবাদের প্রতিরোধের কোনো সাহসিক উজ্জ্বলতা সেও তো শস্যেরই ফলন, সেও একটা কাজ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এই কর্মী মানুষের কবিতা, বাংলা কবিতায় তিনি পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা বিক্তার ভাষা।

কী অর্থে নতুন সেই ভাষা, সেটা লক্ষ করবার জন্য কিছুটা ইতিহাসের কথা তুলতে হবে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের কবিতায় যখন আধুনিকতার আন্দোলন চলছিল, রবীন্দ্রনাথের সবগ্রাস থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য কবিতা কোনো কোনো নতুন পথ খুঁজছিল তখন। বিচিত্র সেই পথগুলির দুটো সাধারণ লক্ষণ ছিল শিল্পিতা আর মনীষিতার আতিশয্য। বোধ নয়, কবিতার প্রধান ভর মেধা—এই সূত্রটির ঘোষণায় রবীন্দ্রনাথও কিছু-বা আপ্লুত ছিলেন মনে হয়, মৃত্যুর একবছর আগে প্রকাশিত 'নবজাতক'-এর ভূমিকায় তাই তাঁকে বিশেষভাবেই বলতে হয়েছিল 'মননজাত অভিজ্ঞতা'র কথা। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, এতদিনকার কবিতায় মনে হতো মানুষ যেন 'নিজের নগ্নতার উপরে পরিয়েছে শিল্পের উত্তরীয়' আর আধুনিক কবিতায় তিনি দেখছেন 'আঙ্গিকের বিস্ফোরণে ভাষাকে উলটপালট করে দেওয়া'। 'শিল্পের উত্তরীয়ই' হোক আর এই উলটপালট করে দেওয়া 'আঙ্গিকের বিস্ফোরণ'ই হোক, দুইয়েরই কেন্দ্রে আছে কোনো-এক প্রসাধনের, শিল্পিতার ঝোঁক। এই ঝোঁক থেকে যে স্মরণীয় কিছু সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এইটেকেই একমাত্র আধুনিক রুচি ভেবে নেবার বিপদে আমরা আচ্ছন্ন ছিলাম অনেকদিন। জীবনানন্দের মধ্যে ছিল এর থেকে বেরিয়ে আসবার প্রাথমিক একটা ইশারা, এর থেকে দূরে থাকবার একটা প্রবণতা। মাথার ভিতরে—মেধা নয়—কোনো-এক বোধ কাজ করছিল তাঁর, আর তারই প্রকাশের জন্য তিনি অনেকখানি শিথিল করে দিতে পেরেছিলেন কবিতার বহিরবয়ব।

এক হিসেবে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সূচনা ছিল এই জীবনানন্দেরই জগৎ

থেকে। 'গোল হয়ে হাতে হাত চাঁদের নিচে ভালোবাসার গানে ভালোবাসতে চাওয়া' 'এত মদ আকাশে! এত মদ বাতাসে!' 'এক ঝাঁক চিল···সূর্যের বলের মতো রঙের চেতনা নিয়ে ক্লান্ত খেলা করে' 'শরৎতের মতো তার স্তনে মুখ রেখে দিল আলো' 'পৃথিবীর গভীর অসুখ জেনে আমি / কালীঘাটে শুয়োর-মোষের শবপচা গঙ্গাজলে হাঁটুঅব্দি কাদায় দাঁড়িয়ে' প্রথম যুগের এইসব উচ্চারণ থেকে শুরু করে একেবারে 'আমার যজ্ঞের ঘোড়া'র 'একটি অসমাপ্ত কবিতা' পর্যন্ত সেই জগতের শব্দ আর প্রতিমাগত চিহ্ন ছড়ানো আছে। 'আদিম অন্ধকারের মুখোসদেবতা / তোমার একটিই আনন্দ / আমাদের মুখ ম্লান করে দেওয়া' কিংবা 'তিমিরবিলাসী অহংকার' 'তিমিরবিনাশী মানুষ' আর 'তবু মানুষের মুখের লাবণ্য থেকে যায়' অভ্রান্তভাবেই আমাদের জীবনানন্দের কথা মনে করিয়ে দেয়, মনে করিয়ে দেয় যে 'তিমিরবিনাশী' 'তিমিরবিলাসী' শব্দগুলিকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কীভাবে প্রায়ই ফিরিয়ে আনেন তাঁদের কবিতায়। কিন্তু শুধু এই নয়, এরও চেয়ে গভীরতর অর্থে এই কবি আমাদের জীবনানন্দের চর্চাকে লক্ষ্যে নিয়ে আসেন, যখন শিল্পমনীষাকে সরিয়ে দিয়ে কবিতার ভাষাকে তিনি দিতে চান সহজাত বোধের ভিত্তি, দিতে চান সটান এবং সরল উচ্চারণের তীব্রতা। প্রচলিত কবিতার জগৎকে তাঁর মনে হতে থাকে 'বড়ো বেশি সাজানো চিৎকার', দেখেন 'বড়ো বেশি শৌখিন বাতাস বয় ধ্রুপদী কবির বাহবায়, ছন্দে, উপমায়, / ত্রিকোণ শব্দের বিস্ফোরণে' (পৃথিবী ঘুরছে) আর সেই বাহবা ছেড়ে দিয়ে কবিতার জন্য অল্পে অল্পে দৈনন্দিনের সমতল এক ভাষান্তর তৈরি করে নেন এই কবি, কেননা

> সারাজীবন শিখলি পরের মুখের কথা
> শুধুই কথা!
> রাজেশ্বরী জননী তোর তাই উপোসে
> রাত্রি কাটায়।
> বোঝে না তোর মুখের ভাষা।
>
> (শীতবসন্তের গল্প)

আধুনিক কবিতায় অভ্যস্ত পাঠকের একটা অংশ অবশ্য এই ভাষার সঙ্গেই পরিচিত। 'রাজেশ্বরী জননী'র জন্য এ নিরাভরণ সহজ ঘোষণার মতো বীরেন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা যেখানে এসে পৌঁছতে চায়, তাতে কি শেষ পর্যন্ত কবিতারও কিছু থাকে—এই প্রশ্ন উঠে এল কারো কারো মনে। কিন্তু কবিতার কিছু থাকে কি থাকে না, তার বিচার হবে কী দিয়ে? সে তো আমাদের পুরোনো শিল্পেরই ধারণা দিয়ে? কোনো রচনা বিষয়ে যখন আমরা কোনো সিদ্ধান্ত করি, তখন আমাদের মনের মধ্যে থেকে যায় সে-বিষয়ে পূর্ববাহিত কিছু কিছু চেতনা, কোনো কোনো প্রাক্-সংস্কার। কবিতা বলতে কী বোঝায়, এ নিয়ে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞার্থ বা প্রত্যাশা থেকেই যায় আমাদের মনে, নতুন কোনো কবিকে পড়বার সময়ে সেইটেরই এক অলক্ষ্য প্রয়োগ করি আমরা, ব্যবহার করি বিচারের একটা প্রচলিত মান। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা এই যে, পাঠককে তিনি বাধ্য করেন সেই মান ভেঙে ফেলতে, তাঁর কবিতা-বিচারের জন্য তৈরি করে নিতে হয় নতুন কোনো মান। প্রধানত ইঙ্গমার্কিন আধুনিকতার বোধ থেকে জেগে উঠছিল তিরিশের যে কবিতাবিষয়ক ধারণা, সরিয়ে দিতে হয় তার চাপ। কী কবিতা, তার কোনো প্রাক্তন বিবেচনা থেকে পাঠক তখন আর এই কবির রচনা পড়বেন না, এই কবির রচনা থেকেই তৈরি হয়ে উঠবে 'কবিতা কী' প্রশ্নের নতুন একটা উত্তর। এই অর্থে, পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের কবির রচনার মতো, তাঁর কবিতা এসে পৌঁছয় এক আধুনিকোত্তর যুগে, কেননা পৃথিবী তো ঘুরছে। এই অর্থে, বাংলা কবিতাকে একটা নতুন ভাষা দিতে পারেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আধুনিকতার ধারণাকে কিছুটা তখন পালটে নিতে হয় আমাদের।

কখনো কখনো কবিতাকে তিনি নিয়ে আসেন মন্ত্রের মতো ঘনতায়। কিন্তু কবিতাকে মন্ত্র করে তোলা কি ভালো? 'মন্ত্র' শব্দ থেকে একসময়ে কি দূরেই সরতে চাননি এই কবি, পরিহাসে? বলেননি কি 'কবিতাকে মন্ত্র করার নিয়ম / শিখতে আমার বয়েস গেল / ...কবিতাকে মন্ত্র করার নিয়ম / ভেবেছিলাম যৌবনের শেষে শিখব'? অন্যের বুকের রক্তে ঘর ভাসলে যদি নিজের বুক হিম হয়ে যায়, যদি তার মধ্যে রাজার চিঠি বা ঈশ্বরের করুণা না দেখতে পান তিনি, তবে হয়তো 'তরুণ কবির উপহাসই / আজ জানলাম আমার জন্য নিয়ম' (সভা ভেঙে গেলে)। কিন্তু, ঐশ্বরিক মন্ত্রের বদলে, সেই

উপহাসের নিয়ম শিরোধার্য করে তিনি তুলে নেন আরেকরকমের মন্ত্র, সেই নিয়মের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রার্থনা হতে পারে

আমার ক্ষুধার রাজ্যে যেকোনো শব্দের মধ্যে
এখন প্রার্থনা থেকে মন্ত্র
মন্ত্র থেকে পবিত্র আগুন
পবিত্র আগুন থেকে মৃত্যু হতে পারি।

(সন্ধ্যা ভেঙে গেলে)

ভয়গুলি এসে যে ঢেকে দিতে চায় এই শব্দ, সেকথা অবশ্য কবি গোপন করেন না। নিজের অনুভব আর অভিজ্ঞতার সমগ্রতা থেকে কথা বলতে চান বলে ক্লান্ত শ্বাস ফেলতেও ইতস্তত করেন না তিনি, মাঝে মাঝে মনে হয় 'চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে, আমি পারলাম না' (আমার যজ্ঞের ঘোড়া), আর তখন, 'সেই থেকে সারাদিন আমি মাথা খুঁড়েছি, শব্দের কাছে, মন্ত্রের কাছে, ভালোবাসার কাছে, ঘৃণার কাছে...'। শপথে অথবা ক্লান্তিতে, মন্ত্র শব্দটিকে কখনোই তবে ছাড়তে চান না তিনি।

কোন্ পথে তিনি পৌঁছন সেইখানে ? জীবনানন্দ তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন, বহুদিনকার অভ্যাসে পৃথিবীতে আমরা 'সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি'। কিন্তু সে-রীতিতে আর তৃপ্ত হয় না মন, 'কেননা 'মানুষের মন তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো / না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল'। প্রাত্যহিক ঐতিহাসিক বিক্ষোভকে কোনো একটা ক্রোধ বা আবেগের ভাষা দেওয়া হয়তো তত কঠিন নয়, কিন্তু সকলেরই হাতে স্লোগান যে মন্ত্রের শরীর পায় না, তার কারণ মাঝখানে থাকে না কবিতার কোনো ঝাঁপ, সেখানে থাকে শুধু এই এলোমেলো নিরাশ্রয়তা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উচ্চারণগুলি উঠে আসে তাঁর সমস্ত সত্তাকে মথিত করে, তাঁর জীবনযাপনের সঙ্গে নিবিড় এক সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে। অনুভূতিদেশ থেকে আলো পায় বলে তাঁর তুচ্ছতম রচনাকেও তখন মনে হয় না স্খলিত, সমস্তটার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্বের এক নিশ্চিত বিন্যাস, আর সেইখানেই তাঁর কবিতার শক্তি।

অনুভূতিদেশ থেকে আলোর কথাটা অবশ্য আরো এক দিক থেকে বিবেচনার যোগ্য। একদিকে যিনি এত সহজ উচ্চারণের কবি, অন্যদিকে তিনি

আবার গভীর অবচেতনেরও কবি, আর এ-দুয়ের মধ্যে তাঁর কবিতায় কোনো বিরোধ নেই। সেই অবচেতনের দেশ থেকে উঠে-আসা একটা আলো ছড়ানো থাকে তাঁর সমস্ত কবিতায়, কোথাও বা স্পষ্টভাবে স্পৃশ্য, কোথাও-বা অলক্ষ্য বাতাসের মতো ঘিরে-থাকা। 'অবচেতনার প্রেমে চতুর্দিক আলো হোক' বলেছিলেন তিনি 'মুখ তোলো, আমার প্রেমিক' কবিতায় (জাতক), আক্ষেপ করেছিলেন 'আমি চেতনার মহানিশা ছিঁড়ে / ঘুমের স্বপ্নের মুখ আনতে পারলাম না!' ঘুম, স্বপ্ন আর বুকের গভীরের কথা যে এ-কবির রচনায় ঘুরে ঘুরেই আসে, তা কারো চোখ এড়িয়ে যাবার নয়, তারই প্রণোদনায় এই সেদিনও তিনি উল্লেখ করতে পেরেছেন : 'আসলে যেকোনো সৎ কবির কবিতার উৎস যদিও তার সচেতন মন, কিন্তু সেখানে কখনও অবচেতনা এবং খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও সুচেতনার কিছুটা রঙ (অথবা রক্ত) লেগেই থাকে।' সেই রক্তেরঙে আমরা পাই তাঁর ছোটো ছোটো এইসব কবিতা :

আঁধারে যায় সীতার চোখের জল
রাত ফুরোয় না। ঝরা পাতার মতো শীর্ণ
বসুমতীর চুমাগুলি কাঁপতে থাকে
শূন্যে। আঁধারে যায় বুকের ক্ষতচিহ্ন;
আমার রাজেশ্বরীর চিতা
জ্বলছে রামায়ণের পালা মাতৃহীন শিশুর কণ্ঠে।

(মহাদেবের দুয়ার)

বা, একেবারে সাম্প্রতিক দিনের,

জ্বলন্ত উনুনের মতো
সেই রাত্রি
পৃথিবীকে মনে হচ্ছিল
আগুনের ভিতর
চিৎ হয়ে সাঁতার কাটছে
দূরের আকাশে অসংখ্য গ্রহ আর নক্ষত্র
তারা কথা বলছিল চোখ দিয়ে, যাতে কোনো শব্দ না হয়
এক সময়ে সবকথা শেষ হয়ে গেল
পৃথিবীর আর কোনো চিহ্ন রইল না।

(অথচ ভারতবর্ষ তাদের)

বুকের যে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে জ্বলে ওঠে অবচেতনের এই চিতা বা জ্বলন্ত উনুন, সে-ক্ষত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আদ্যন্ত ছড়ানো। প্রথম যৌবনের তুলনায় পরিণত প্রৌঢ়িতে তিনি সমসাময়িককে অনেক বেশি মুহুর্মুহু তুলে নিয়েছেন তাঁর কবিতায়, সেকথা ঠিক। আমাদের সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের ইতিহাস অনেক বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে এসেছে তাঁর শেষ পনেরো বছরের কবিতায়, পথচলতি দুঃখের যাপনে আর লড়াইয়ের মিছিলের আরো অনেক ভিতরে সংলগ্ন হয়ে এসেছে তাঁর কবিতা। কিন্তু তবু মনে রাখা চাই যে সাময়িক উত্তেজনার মুহূর্তে সাড়া দিয়ে ওঠাই তাঁর রচনার একমাত্র মহিমা নয়, রাষ্ট্রিক ইতিহাসে কখনোকখনো একটা উৎকট অত্যাচার আর তার প্রতিরোধের চেহারা প্রকাশ্য হয়ে উঠে, কখনো-বা তার প্রবাহ চলতে থাকে ঈষৎ তির্যক চালে। কিন্তু যিনি কবি, মূলত যিনি দ্রষ্টা, তিনি তো দেখতেই পারেন দূরকে আর ভিতরকে। সেই দৃষ্টি নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জরুরি অবস্থার একযুগ আগেই লিখতে পেরেছিলেন

> মুখে যদি রক্ত ওঠে
> সে-কথা এখন বলা পাপ
> এখন চারদিকে শত্রু, মন্ত্রীদের চোখে ঘুম নেই ;
> এসময়ে রক্তবমি করা পাপ ; যন্ত্রণায় ধনুকের মতো
> বেঁকে যাওয়া পাপ ; নিজের বুকের রক্তে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা পাপ।
>
> (মুখে যদি রক্ত ওঠে)

এই কবিতায়, এবং তারও অনেক আগে থেকে, কবি প্রধানত চেয়েছেন একটা ভালোবাসার সুস্থ জগতের স্বপ্ন দেখতে, সকলের 'বুকের মধ্যে ঘুমুতে' চেয়েছেন তিনি, মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে নয়, 'বুকের মধ্যে জেগে উঠতে' চেয়েছেন তিনি, 'মুখের কথা শুনতে নয়' (সভা ভেঙ্গে গেলে)। কিন্তু সেই স্বপ্নের পথে কেবলই বাধা হয়ে আসে ক্ষুধা, লাঞ্ছনা, ভয়। জীবনজোড়া এরই সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ, তাঁর কবিতারও ইতিহাসজোড়া সেই যুদ্ধ। একথা ঠিক, সে-যুদ্ধে তিনি বয়সের সঙ্গেসঙ্গে আরো বেশি তারুণ্যের দিকে এগিয়ে আসেন, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই বলেন

যোদ্ধার হৃদয় বলে কিছু নেই ?
নেই পিছুটান ?
যেখানে সন্ধ্যাবাতি জ্বলে, শিশুকালে
মানবী ছায়ার মতো—শীর্ণ, প্রতীক্ষায়···
বন্দুকের নল ছাড়া তার চোখে আর কোনো স্বপ্ন নেই ?

(অথচ ভারতবর্ষ তাদের)

সেই স্বপ্ন আছে বলেই মনে হতে পারে যে 'আদর্শ মুখের প্রসাধন নয়, সারা জীবন তাকে লালন করতে হয় / রক্তের মধ্যে' (অথচ ভারতবর্ষ তাদের), আর সেই লালন যদি রক্তেরই মধ্যে হয় তবেই বলা যায় এই সতর্কবাণী :

তোমার কাজ আগুনকে ভালোবেসে উন্মাদ হয়ে যাওয়া নয়
আগুনকে ব্যবহার করতে শেখা
অস্থির হয়ো না
শুধু, প্রস্তুত হও। (পৃথিবী ঘুরছে)

নিশ্বাসেপ্রশ্বাসে তখন লিপ্ত হয়ে থাকে দেশ পৃথিবী মানুষ, স্বপ্নে তখন জেগে থাকে এই কথা যে 'সব মানুষের জন্য একটি সত্যিকারের স্বদেশ জন্ম নিচ্ছে—আমি তার নাগরিক' (শীতবসন্তের গল্প) থাকে মানুষের জন্য এই বিশ্বাস যে 'কারো সাধ্য নেই একেবারে নষ্ট করে তাকে' (ভিসা অফিসের সামনে), কিংবা 'আমাদের নরকবাসের অভিজ্ঞতাই বাঁচাবে আমাদের সন্তান-সন্ততিদের / অথবা তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু সেই ধ্বংসের পরে আসবে নতুন দিন' (অথচ ভারতবর্ষ তাদের)। এত যে বিশ্বাস, ক্যান্সারে মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন আগেও এত যে শক্তি, তার কারণ এই যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূলত ভালোবাসার কবি, কেবল, সেই ভালোবাসার সময়ে তাঁর চারপাশের আগুনকে তিনি ভোলেন না কখনোই, বলেন

এসো আমরা আগুনে হাত রেখে
প্রেমের গান গাই।

(মুখে যদি রক্ত ওঠে)

আর, 'আমার যজ্ঞের ঘোড়া'য় যেমন বলেছিলেন তিনি, সেই 'প্রেমের গান গাইতে গাইতে / একদিন তার গলা ভেঙে' যায়।

বিশেষণে সবিশেষ

প্রিয় জ্যোতি, 'কলকাতা দুহাজার' এর শরৎ-সংখ্যাটি হাতে তুলে দিলেন সেদিন এবং পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখার প্রতিশ্রুতি আদায় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন ক্ষিপ্র পদক্ষেপে। আকর্ষণ করবার মতো কোনো-না-কোনো রচনা থাকবেই এ-পত্রিকায়, এই বিশ্বাসে পাতা ওলটাচ্ছি আপনার নিষ্ক্রমণের ঠিক পরেই, এমন সময়ে চোখ এসে নিবদ্ধ হলো 'লেখক-পরিচিতি'র পাতায়, যেখানে লেখা আছে : 'হ্যাঁ, এই সনেট-অনুবাদক রঞ্জিৎ গুপ্তই হচ্ছেন সেই নকশাল-দমনকারী পুলিশ কমিশনার, পোলো ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, নৃতাত্ত্বিক, চাষী এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট রঞ্জিত গুপ্ত আই পি।'

এই লেখকের নাম অবশ্য আপনার পত্রিকায় প্রায় নিয়মিতই দুভাবে ছাপা হয়, বার্ষিক সাহিত্যসংখ্যায় প্রচ্ছদের এপিঠে-ওপিঠেও যেমন ছিল রঞ্জিৎ আর রঞ্জিত, যদিও আশা করি লেখক নিজে 'রঞ্জিত' বানানেই লেখেন, 'রঞ্জিৎ' নয়। কিন্তু বানান দেখেই যে চোখ এখানে থমকে গেল এমন নয়, ভাবনাটা আলোড়িত হলো পরিচয় জানাবার বিশেষ এই পদ্ধতিতে, বিশেষণের এই মর্মান্তিক নির্বাচনে, এই সগৌরব ঘোষণায় যে ইনিই সেই নকশাল-দমনকারী পুলিশ অফিসার। কয়েকমাস আগে ইলাস্ট্রেটেড উইকলি-র ধারাবাহিক দুই সংখ্যায় এই দমনের কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘাময় বিবরণ যে লিখেছেন রঞ্জিত গুপ্ত, তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়। কিন্তু তাঁর নিজের লেখা হলো এক কথা, আর আপনার কলমে তার নির্যাস ভেসে-আসা হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। অনুমান করি যে এ-উল্লেখে আপনি বোঝাতে চেয়েছেন শুধু লেখকের বৈচিত্র্যটুকুই, এমনকী হয়তো আত্মবিরোধটাই, পোলো খেলা এবং নকশাল-দমনের এই চমকপ্রদ সহাবস্থান, বিবরণে সম্পূর্ণতার গরজ ছাড়া ওখানে নিশ্চয় আর কোনোরকম অতিরিক্ত অভিপ্রায় কাজ করেনি। অথচ এই কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ যে মুহূর্তমধ্যে আমার মতো অনেক পাঠকের সামনে ঝাঁপ দিয়ে ওঠে

এক বিষাক্ত ছোবল নিয়ে, সেকথাও সত্যি। হতচকিত আমাদের মনে হয় যে কথাটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল যেন ওই বিশেষণটির প্রতি সম্পাদকের কোনো অনাবিল প্রশ্রয়, সস্নেহ সমর্থন।

নকশালপন্থায় আপনার কিছুমাত্র আস্থা থাকবার কথা নয়। তাই, যদি তার দমনকারী বিষয়ে এমন কোনো প্রশ্রয় বা সমর্থন প্রকাশ পেয়েও থাকে, তাতেই-বা আমাদের কী বলবার আছে? আপাতত মনে হতে পারে, কিছু নয়। কেবল, ওই 'দমন' শব্দটি শুনবার সঙ্গেসঙ্গে পনেরো বছরের পুরোনো ছবিগুলি আবার জেগে উঠতে থাকে আমাদের চোখের সামনে, জেগে ওঠে কত -না স্বজন বন্ধু ছাত্র-ছাত্রী অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের মুখ, আমার আপনার সকলেরই বেশ চেনাজানা, কিছু-বা সংকল্পে উজ্জ্বল, কিছু-বা নির্যাতনে বধির, যারা অনেকেই হয়তো বিভ্রান্ত ছিল সেদিন, কিন্তু যাদের আর্ত কল্পনার সামনে ছিল মস্ত এক সুস্থ দিনের স্বপ্ন। পুলিশ কমিশনার হিসেবে রঞ্জিত গুপ্তেরও মনে হয়েছে যে এদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য যা দরকার তা হ'লো 'civilised police action and coercion with humanity'। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি-র পাতায় সভ্যতা আর মানবতার এই শব্দদুটি যখন আজ পড়ি, তখন মনে পড়ে বেলেঘাটার কথা, বরানগরের কথা, দমদম আর বহরমপুর সেণ্ট্রাল জেলের অন্তর্গত নৃশংস আর অবাধ হত্যাকাণ্ডের কথা, মানবতাকেই যার প্রধান ভিত্তি বলে বিবেচনা করা শক্তই ছিল সেদিন। দমনের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলি কি আজও কিছু কিছু মনে পড়ে আপনার?

আপনি না বললেও অন্য কেউ হয়তো বলতে পারেন যে বীভৎসতা তো ছিল উলটো দিকেও। খতমের সেই রাজনীতি কি শ্রেণীশত্রু নিধনের নামে একটা অরাজক বিশৃঙ্খলাই তৈরি করে তোলেনি? তারও নির্মমতা কি ভাববার নয়? প্রশাসনের দিক থেকে শৃঙ্খলার দাবিতে কিছু দমন কি তাই প্রত্যাশিতই নয়?

কী হয়েছিল সেই দমনের প্রক্রিয়া, সেটা ভাববার আগেও অবশ্য লক্ষ করা দরকার এই বিশৃঙ্খলার চরিত্রটা। এরও একটা ইতিহাস আছে। নকশালপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে, যে-কোনো কৌশলেই হোক, মিশে গেল লুম্পেন প্রোলিটারিয়েটরা। আবার লুম্পেন প্রোলিটারিয়েটদেরই প্রয়োগ করা

হলো এদের ধ্বংস করবারও কাজে, এর বিবরণ আজ রঞ্জিত গুপ্ত নিজেই বলছেন। কিন্তু তার বিবরণে তিনি স্পষ্টত বলেননি জেল বা জেলের বাইরে সেই রাজনৈতিক ছেলেমেয়েদের কথা, যারা লুম্পেন নয়, ওই ফাঁদে জড়িয়ে নিয়ে যাদের ওপর পুলিশি মত্ততা চলেছিল উৎকট হিংস্রতায়। উনিশশো সত্তর সালের জুলাই থেকে পুলিশ কমিশনার হন রঞ্জিত গুপ্ত, আর আমাদের মনে পড়ে সে-বছরেরই নভেম্বরের এক ভোররাত, যখন বেলেঘাটার পাঁচশো বাড়িতে হানা দিয়ে চুয়াল্লিশটি পুলিশভ্যান টেনে বার করে কিছু স্কুলকলেজের ছাত্রকে, আর প্রমাণহীন বিচারহীন ভাবে চারজনকে গুলি করে মেরে ফেলে সেখানেই, প্রকাশ্য অঞ্চলে। শ্যামপুকুর পার্কের কাছে চোদ্দ বছর বয়সের টাই-ফয়েড-আক্রান্ত একটি ছেলেকে পথে নিয়ে এসে দিনের আলোয় খুন করে পুলিশ, শ্যামপুকুর রোডে ডেপুটি কমিশনার নিজেরই হাতে গুলি করেন দুজনকে, বেলঘরিয়াতেও ঘটে একইরকমের ঘটনা। আর এসব জানিয়েছেন সেদিন লোকসভার সদস্যদের এক তদন্তকারী দল, যে-দলের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমেনন, হীরেন মুখোপাধ্যায়, অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বা জ্যোতির্ময় বসুরা। সে-তদন্তে এ খবরও তাঁরা জানিয়েছেন যে প্রতিটি মধ্যরাতে পুলিশ শ্মশানঘাটে নিয়ে আসে চোদ্দ থেকে তিরিশ বছরের অন্তর্গত অসংখ্য যুবাকিশোরের দগ্ধ শরীর, এই তথ্য বিষয়ে তাঁরা অবহিত। অথবা ভাবুন একাত্তর সালের চব্বিশে ফেব্রুয়ারিতে বহরমপুর জেলের কথা। বেয়নেট আর লাঠি দিয়ে চারজনকে পিটিয়ে মারা হয় সেলের অভ্যন্তরে, তিনজনের মৃত্যু হয় হাসপাতালে পৌঁছে, আরো একজন পরে। দমদম সেন্ট্রাল জেলে একইভাবে হত্যা করা হলো একদিন ষোলটি ছেলেকে, আহত আরো অগণ্য। কিংবা ভাবুন বরানগরের-কাশীপুরের সেই হিংস্র আরণ্যক দিনদুটির কথা, বারো আর তেরোই আগস্ট, যখন তালিকা-চিহ্নিত করে দেড়শো ছেলেকে খুন করা হলো বাড়ি বাড়ি ঘুরে, পথের মোড়ে লট্‌কে দেওয়া হলো নাম, সকলের অভিজ্ঞতার সামনে, যেন প্রশাসনহীন জগতে। প্রতিবাদে বন্‌ধ্‌ ডাকবার কথা ভেবেছিলেন সেদিন জ্যোতি বসু, শেষ পর্যন্ত সেটা ঘটেনি যদিও।

মৃত্যু অবশ্য কখনো কখনো ত্রাণ। খুন করা হয়নি যাদের, তাদের ওপর শারীরিক অত্যাচারের বিবরণ হয়তো-বা নাৎসি ক্যাম্পের সঙ্গে তুলনীয় হতে

পায়ে, মেয়েদেরও যেখানে নগ্ন করে উলটোভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দিনের পর দিন, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অত্যাচারে ভরে দেওয়া হয়েছে শরীর। 'চিৎকার করবে না, ওদিকের দেওয়ালের দিকে দুজন দাঁড়িয়ে আছে, ওদের হাতে সিগারেট। চিৎকার করলে তোমার শরীরে কিছু কিছু চিহ্ন স্থায়ী হয়ে যাবে। এই চিহ্ন পরে অনুধাবন করতে গিয়ে কিছু আত্মহত্যা করেছে, কিছু পাগল হয়ে গেছে, এ সংবাদ আমাদের কাছে আছে।' না, এ বিবরণ নকশাল-দমন বিষয়ে নয়, 'কলকাতা দু-হাজার'-এর ওই একই সংখ্যার 'ভূ-নয়না' কাহিনী থেকে উদ্ধৃত এই বাক্যাবলি—কিন্তু কী চমৎকার মানিয়ে যায় আমাদের সেই পুরোনো ইতিহাসেরও সঙ্গে! 'যে বিপ্লব ব্যর্থ হলো' শিরো-নামে রঞ্জিত গুপ্তের লেখাটি শেষ হয়েছে এইভাবে যে নকশালপন্থী তত্ত্বচিন্তার আর অভ্যুদয়ের কোনো চিহ্নই আর টিঁকে নেই পশ্চিমবঙ্গে, আছে কেবল মাসিক পেনশন নেবার জন্য পুলিশবিধবাদের লম্বা কিউ। আর আছে সেইসব বাড়ি, অল্পবয়সীরা উধাও হয়ে গেছে যেসব বাড়ি থেকে: যাদের কেউ-বা লুকিয়ে আছে বিচারের ভয়ে, অন্য দলের হাতে মারা গেছে কেউ, নিজেদেরই দলের হাতে নিঃশেষ হয়েছে কেউ-বা। ঠিক, কিন্তু লুপ্ত হয়ে যাবার এই সংহত বর্ণনায় বর্জিত হলো তাদের কথা, যারা অনেক শারীরিক আর মানসিক পঙ্গু-তার চিহ্ন নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে পরে, 'কিছু আত্মহত্যা করেছে, কিছু পাগল হয়ে গেছে' ওই গল্পের ভাষায়, অথবা যারা গারদের ভিতরে রয়ে গেছে আজও কোনো সুদূর বিচারের প্রতীক্ষায়।

পরিচয়সূত্রে 'পোলো ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট' কথাটা লিখবার সময়েও কি রঞ্জিত গুপ্তের প্রবন্ধটির কথা ঈষন্মাত্রায় লক্ষ্যে ছিল আপনার? বিপর্যস্ত বিড়-ম্বিত অস্থির সেদিনকার পরিবেশে নির্বাচন সম্ভবপর হবে কি না, সেটা বুঝবার জন্য যখন কলকাতায় এসেছিলেন মানেকশ এবং মন্ত্রণাঘরে সকলেরই সুরে যখন ধ্বনিত হচ্ছিল শুধু 'না', পুলিশ কমিশনার তখন জোর দিয়েই বলেন যে এপ্রিলে নির্বাচন হবার কোনোই বাধা নেই। আর ঠিক তার পরেই, লিখছেন তিনি, Equally seriousely I added 'But we need nine polo horses at once, we have very few, I'm afraid'। এই সময়ে যখন পোলো খেলবার কথাও ভাবতে পারছেন ইনি, তখন নির্বাচন যে অবশ্যই সম্ভব,

সেটা জানিয়ে দিয়ে চলে গেলেন মানেক্‌শ আর তাঁর দলবল। নির্বাচন হলো।

কিন্তু একটা রাজনৈতিক তত্ত্বচিন্তার যে এইভাবে অবসান হয়ে গেল, এটা ভাবা হয়তো ভুল। পোলোর দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনলে এই পঁচাশি সালে এত নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে সেই বিপ্লবী চিন্তার বা তার ইতিহাসের সব রেশ নিঃশেষ হয়ে গেছে। রঞ্জিত গুপ্ত তাঁর লেখায় এই আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালির মানস-প্রবণতার অতীত সূত্রগুলিকে মিলিয়ে দেখেছেন সংগতভাবেই, আর আজ কি আমরা ধরে নেব যে সেই প্রবণতার একেবারে সর্বস্বান্ত বিনাশ ঘটে গেল ? দেশের কোণে কোণে তাকিয়ে দেখলে সে-কথাটাকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করা শক্ত। দমনকারী হিসেবে অতটা আত্মতৃপ্তিরও তাই কোনো কারণ দেখি না

আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন যে নকশালপন্থার সমর্থন বা অসমর্থন আমার এই চিঠির বিষয় নয়। একথা আমরা সবাই আজ জানি যে ওই পন্থারও আছে হাজার উপপথ, জানি যে খতমের সেই বিশেষ রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সেদিন নকশালপন্থীদেরও অনেকে। অসিত সেন, সুশীতল রায় চৌধুরী, চারু মজুমদার, অসীম চ্যাটার্জিদের পারস্পরিক বিতর্কের কথাও একেবারে অজানা নয়। তখন এবং এখনো, নানারকমের মত আর মতান্তরে সামাজিক বিপ্লবের কথা ভেবেছেন/ভাবছেন নিশ্চয় অনেক, নকশালপন্থী হিসেবে, কিংবা একেবারে তার কোনো বিপরীত পথে। এর কোনোটির প্রতি আমাদের সমর্থন থাকতে পারে, কোনোটির প্রতি-বা তীব্র অসমর্থন। কিন্তু শৃঙ্খলার অজুহাতে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের নামে যখন একটা প্রজন্মকে বিকৃত বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয় পুলিশের অন্ধকার গুহায়, তখন তার বিরুদ্ধে যদি আমরা সরব হতে নাও পারি, তার সপক্ষে যেন আমরা কখনো না দাঁড়াই এতটুকু ধিক্কার যেন আমাদের অবশিষ্ট থাকে যা ছুঁড়ে দিতে পারি সেই জেলপ্রাচীরের দিকে, যার অভ্যন্তর ভরে আছে বহু নিরপরাধের রক্তস্রোত আর মাংসপিণ্ডে,ব্যক্ত আর অব্যক্ত বহু আর্তনাদের স্তরান্বিত ইতিহাসে। ব্রিটিশদের কাছে, রঞ্জিত গুপ্ত লিখছেন, ক্রাইম ছিল দুরকমের : রাজনৈতিক আর অরাজনৈতিক। সেই একই ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন মাত্রকেই ক্রাইম বলে চিহ্নিত করতে চায় যে-পুলিশ, তার দানবিক দমনের

দিকে কিছু প্রতিরোধ অন্তত প্রযোজ্য, কোনো প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত সেখানে ভয়াবহ। মনে কি পড়ে 'কলকাতা দুহাজার' এর ওই সংখ্যাতেই অজিতকুমার মিত্র লিখেছেন এক রাধাচরণ প্রামাণিকের কথা. 'যার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ৭ বছর কারাদণ্ড হয়, এবং, যে ঐ জেলেই, তিন বছর পরে, পাগল অবস্থায় মারা যায়' ? লেখা হয়েছে 'এই রাধাচরণের আবক্ষ মূর্তি যে মুদ্রিত করবেন, তারও অবকাশ রাখেনি বিদ্রূপময় ইতিহাস', কেননা তার কোনো ছবি নেই। ব্রিটিশ ভারতের সেই দিনের পঞ্চাশ-ষাট বছর পরেও ইতিহাসের বিদ্রূপ কিন্তু থামেনি, রাধাচরণের মতো অনেক কিশোর পনেরো বছর আগে নামহীন চিহ্নহীন লুপ্ত হয়ে গেছে এই দেশে, কেবল একটা স্বপ্নকে ভালোবেসেছিল বলেই।

সামান্য একটি শব্দের উপলক্ষ নিয়ে একটু বেশি বলা হয়ে গেল বোধহয়, ভাবছি এখন।. কিন্তু হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন যে নিতান্ত সামান্য নয় ওই শব্দের নিহিত সম্প্রসার, সামান্য নয় দীর্ঘকাল জুড়ে স্মৃতির মধ্যে বয়ে বেড়ানো বিরাট একটা-সময়ের সেই ক্ষত, আমার আপনার সকলেরই। বিশ্বাস হয় না যে এ নিয়ে কোনো মতভেদ হবে আমাদের, নিছক লঘুভাবেই নিশ্চয় শব্দকটি উঠে এসেছিল আপনার কলমে। সেটা অনুমান করেও যে এতখানি লিখলাম সে কেবল এইটুকু বোঝাবার জন্যে যে কোনো-কোনো শব্দ কেমন অতর্কিতে এসে আঘাত করতে পারে কোনো পাঠকের চেতনায়, কীভাবে তাতে আবর্তিত হয়ে উঠতে পারে বাস্তব অবস্থান বিষয়ে আমাদের চারপাশের ধারণা। এই মুহূর্তে, এ ছাড়া আমার আর লিখবার কিছু নেই।

ভালোবাসা জানবেন।